প্রকাশ ১৩৫৯ ফাল্গুন

প্রকাশক শ্রীপুলিনবিহারী সেন
বিশ্বভারতী। ৬।৩ দ্বারকানাথ ঠাকুর লেন। কলিকাতা

মুদ্রাকর শ্রীপ্রভাতচন্দ্র রায়
শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস লিঃ। ৫ চিন্তামণি দাস লেন। কলিকাতা
৩·১

নিবেদন

অসমীয়া সাহিত্য সম্বন্ধে জ্ঞাতব্য ও বক্তব্য এত বিষয় আছে এবং সে সাহিত্য এত বিশাল যে সামান্য পুস্তিকায় তাহার যথোপযুক্ত আলোচনা সম্ভব নয়। তাহা ছাড়া নানা পুঁথির পাঠ কাল ও অর্থ লইয়াও মতান্তর আছে। আমি নিজে অসমীয়াভাষী বা বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত নই। সাধারণ রসপিপাসু মানুষ হিসাবে অসমীয়া সাহিত্য পড়িয়াছি, তাহার রসগ্রহণ করিয়া আনন্দ পাইয়াছি, তাহার ইতিহাস আলোচনা করিয়া মুগ্ধ হইয়াছি—অনধিকারীর পক্ষে ইহাই যথেষ্ট লাভ। আমার মধুকরী মন পাঁচ জনের দরজা হইতেই মুষ্টিভিক্ষা সংগ্রহ করিয়াছে। হয়তো নূতন কিছু বলি নাই, বলিবার ক্ষমতা নাই। শুধু সশ্রদ্ধ চিত্তে সংগ্রহ করিয়াছি, সন্ধান দিয়াছি। প্রতিবেশী সাহিত্যের আলোচনা যেন আমাদের বার্ট্রান্ড রাসেল কথিত সেই স্তরেই লইয়া যায়, যেখানে 'Lessening of fanaticism with an increasing capacity of sympathy and mutual understanding'ই সাহিত্য-পাঠের লাভ হয়।

যাঁহারা আমাকে এইসব আলোচনায় উৎসাহ দেন তাঁহাদের মধ্যে রাজ্যপাল শ্রীযুক্ত শ্রীপ্রকাশ, শ্রীযুক্ত জয়রামদাস দৌলতরাম, সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডক্টর শ্রীসূর্যকুমার ভুইঞা ও দিল্লীর শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ ঘোষকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

শ্রদ্ধাভাজন শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন মহাশয়ই প্রথমে আমাকে অসমীয়া সাহিত্য সম্বন্ধে কিছু লিখিবার জন্য শুধু প্রেরণা নয়, নানা পুস্তক ও উপদেশ দিয়া সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাকে বিশেষ করিয়া আমার সশ্রদ্ধ নমস্কার ও ধন্যবাদ জানাই।

বিশ্বভারতী গ্রন্থনবিভাগের কর্তৃপক্ষকেও আমাকে এই সুযোগদানের জন্য আন্তরিক ধন্যবাদ দিতেছি। যুগে যুগে দেশে দেশে নবজাগৃতির ছন্দে কবিগুরুর আদর্শ ব্যাপ্ত হোক—

যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্

শ্রীসুধাংশুমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচী

১. অসমীয়া সংস্কৃতির রূপ

ঋগ্বেদের ঋষি বলিলেন—অজনয়ৎ সূর্যং বিদদ্‌গা, অক্তুনাহ্নাং বয়ুনানি সাধ্য— ইন্দ্র জন্ম দিলেন সূর্যের, ফিরিয়া পাইলেন জ্যোতির সমষ্টি, রাত্রির মধ্য হইতে দিনের প্রকাশ ঘটাইয়া। সংস্কৃতির একটি মূল সূত্র এই তথ্যের মধ্যে নিহিত। ঘাতপ্রতিঘাতের মধ্যে, দানপ্রদানের মধ্যে, সংস্কারের পুনরাবর্তনে ও বিবর্তনে জীবনের রূপান্তর ঘটে—রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব। সেই রূপান্তরের পথ বাহিয়া সাহিত্য ও শিল্পের মাধ্যমে জাতীয় সত্তা শুধু প্রকাশিত নয়, বিকশিতও হয়। প্রাণশক্তি সৃষ্টিশীল—সৃষ্টির পথ সে নিজেই খুঁজিয়া লইয়া নিত্যসম্মুখ ও রূপান্তরিত হইয়া উঠে। ব্যষ্টির জীবনে যে ক্রমবর্ধমান ও ক্রমসঞ্চয়ী নিয়ম, সমষ্টির জীবনেও সেই চিরন্তনী প্রাণলীলার প্রকাশ। যুগে যুগে দেশে দেশে সাহিত্য সেই চলমান জীবনধারার রসমূর্তি প্রকাশ করিয়া সার্থক হইতেছে। চলিষ্ণু সমাজ ও গতিশীল মানবচিত্তের সহিত সমতা রাখিয়া যে সাহিত্যিক রস রচনা হয়, তাহাই জাতির জীবনে তার স্পর্শ রাখিয়া যায়। হঠাৎ যেন একদিন নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ হয়, যদিও তার প্রস্তুতি বহুদিনের। দুকূল প্লাবিয়া সেই মননস্রোত চলে।

সাহিত্যের ইতিহাসকেও তাই বলা চলে চলমান জীবনধারার বিভিন্নমুখী প্রকাশের কাহিনী। সাহিত্য শুধু বহিরঙ্গের নয়, অন্তরঙ্গেরও, অন্তর্দ্বন্দ্বেরও। ভাবে, ভাষায়, ইঙ্গিতে, ভঙ্গীতে গদ্যে পদ্যে কাহিনী যখন রসোত্তীর্ণ হয় তখনই তাকে আমরা সাহিত্যের পদমর্যাদা দিই। সাহিত্য বা ইতিহাস শুধু অতীতের কঙ্কাল নয়। প্রকৃত সাংস্কৃতিক ঐতিহাসিক জীবনকে উপলব্ধি করেন তার সমগ্রতার মধ্যে। শিল্পে, রাষ্ট্রগঠনে, কর্মপ্রচেষ্টায়, ধর্মসংঘটনে যেমন তার প্রকাশ, তেমনি বিকাশ লিখিতভাবে—ভাষায়, কাব্যে, গল্পে, কাহিনীতে, নাটকে, উপাখ্যানে। শুধু তাম্রশাসন, শিলালিপি, শাসক সম্প্রদায়ের কাহিনী, সাল, অব্দ জীবনের গতিশীল রসের সম্যক পরিচয় দেয় না, সেইজন্য যুগে যুগে রসসমুদ্রে লীন সেই সত্যকে কল্পনার রঙে প্রতিফলিত করিয়া দেখানো হয়। প্রাচীন ইজিপ্টের সম্রাটকবি ইখনাটোন হইতে আজিকার দিনের কবিসম্রাট রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত এই রসানুভূতিপ্রবণতাতেই সাহিত্যের সৃষ্টি করিয়াছেন। যে কোনো যুগের সত্যকার সাহিত্যকে খুঁজিয়া পাইতে হইলে সাহিত্যের ঐতিহাসিককে ডুব দিতে হইবে গভীরে। যিনি যে যুগের বা জাতির রসসৃষ্টির কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবেন তিনি সেই যুগের মনটিকে খুঁজিয়া বাহির করিবেন। স্রষ্টার পাশে তিনি দ্রষ্টা। তাঁকে অনুসন্ধান করিতে হইবে সেই যুগের ধ্যানময়, রসময়, ভাবময় মনটিকে—তার অখণ্ড সত্তাকে—যে মন নড়ে, যে মন গড়ে, সৃষ্টি করে, দৃষ্টি দেয়, যে মৃত্যুঞ্জয় মন বাঁচিয়া থাকে ধারাবাহিকতার মধ্যে, যার প্রকাশ শুধু কথার প্যাঁচে প্যাঁচে দাদার চৌপদীতে নয়, নানা ভঙ্গীতে, রূপে ও রূপান্তরে। সাহিত্যের ইতিহাস একটা জাতির প্রবহমান ভাবধারার ইতিহাস, সেটা শুধু একটা সমষ্টিচেতনা বা কৌলিক চেতনা নয়, সহস্র হৃদয়ের রম্য স্পন্দন। প্রাচীন সাহিত্য শুধু অতীতের কাহিনী নয়, বর্তমানের পটভূমি, ভবিষ্যতের ভিত্তিভূমি—একটা অসমাপ্ত ধারা। তাই

অনাগতদিনের রূপও উপ্ত ও প্রচ্ছন্ন আছে তার প্রতি পত্রে ও ছত্রে। সাহিত্য মানুষের নিজেরই অন্তরতম পরিচয় এবং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় "এই পরিচয় সমস্ত জাতির জীবনযজ্ঞে জ্বালিয়ে তোলা অগ্নিশিখার মতো। তারই থেকে জ্বলে তার ভাবীকালের পথের মশাল তার ভাবীকালের গৃহের দীপ।" ভারতের এই প্রাত্যন্তিক প্রদেশের চলোর্মি ইতিহাস ও কৃষ্টিসংঘর্ষের বিচার করিলে দেখা যায় যে প্রাচীন আর্য-সভ্যতা এখানে আগন্তুক হইলেও আত্মপ্রতিষ্ঠিত। তাহার পূর্বে অবশ্য অস্ট্রিক, নিগ্রোবটু, কিরাত, বোড়ো, ভোটচীনরা আসিয়াছে। আলৌহিত্য ব্রহ্মপুত্রের এপারে ওপারে নাগা, মিকির, খাসি, জয়ন্তীয়া প্রভৃতি পার্বত্য জাতিরা, প্রাগ্‌জ্যোতিষ কামরূপে আর্যসভ্যতার প্রাচুর্য, পরে তন্ত্রমতের প্রতিষ্ঠা, বৌদ্ধধর্মের প্রভাব, শৈববাদ, শ্রীহট্ট, কাছাড়, মনিপুর হেরম্বদেশে মগধগৌড় সভ্যতার প্রসার, পরবর্তীকালে শান জাতির অহম শাখার অভিযান অসমীয়া সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে এক বিচিত্র রূপায়নে পরিণত করিয়াছে। ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরতম প্রবণতা কবির ভাষায় এইখানে সম্পূর্ণ ভাবে প্রযুজ্য, মহাভারতের বীজ এইখানে প্রচ্ছন্ন। মহামানবের সাগরতীরে সুদীর্ঘকালের ইতিহাসের মণিমেখলায় কত কথা ও কাহিনী, কত কিম্বদন্তী, কত গাথা যে গ্রথিত আছে তার ইয়ত্তা নাই। তার সাহিত্যিক বা ঐতিহাসিক মূল্য কতটুকু, নিক্তির ওজনে সমালোচকের নিরিখে তাহার বিচার হউক আপত্তি নাই, কিন্তু মানবমনের চিরন্তনী বেদনার ইতিহাসে, রসবেত্তার মর্মকোষেও তাহার একটা নিজস্ব মূল্য আছে, তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নরক ভগদত্ত, বাণ ঊষা অনিরুদ্ধ, অর্জুন চিত্রাঙ্গদা, উলূপী বভ্রুবাহন, ভীম হিড়িম্বা, শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণী সত্যভামা, ভাস্করবর্মা, হিউয়েনচাঙ, শীলভদ্র, মৎস্যেন্দ্রনাথ, অভিনবগুপ্ত, কামেশ্বর মহাগৌরীর উপাসকরা, শালস্তম্ভবংশীয় নৃপতিগণ, কুচিয়া জাতির আদি পুরুষ কুন্তী ও আদি জননী মামা, ব্রা বি, আইগোসানী, তাম্রেশ্বরী, কমতাধিপতি পৃথুরাজ, সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষক দুর্লভনারায়ণ, মূলাগাভরু, হেড়ম্বপতি তাম্রধ্বজ, জৈন্তাধিপতি রামসিংহ, স্বর্গদেবগণ, বড়গোহাঁই বুঢ়াগোহাই, তামুলি করবরুয়া, লাচিত বড়ফুকন, নিত্যপাল, তুলারাম, রাজা শিবসিংহ, রানী ফুলেশ্বরী, অম্বিকাদেবী কনকলতা, নিরঞ্জনবাপু, সর্বোপরি মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্কর দেব, মাধব দেব, দামোদর দেব, রামায়ণকার কন্দলী ও তাঁদের শিষ্যগণ আসামের ইতিহাস, সাহিত্য ও মন জুড়িয়া বসিয়া আছেন।

এই প্রসঙ্গে 'আহোম' ও 'অসমীয়া' এই দুইটি শব্দের পার্থক্যের কথা বলা যাইতে পারে। ১৮৪১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Robinson-এর *Descriptive Accounts of Assam*-এ দেখি, আসামকে বলা হইয়াছে অ সম, unequalled বা unrivalled। স্যার এডোয়ার্ড গেট্‌ও peerless অর্থে ইহাকে গ্রহণ করিয়াছেন। তাইশাখার শানেরা ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যখন এই প্রদেশে আসে, তখন তাহাদের আ সাম, অ সম, আ চাম, অ হম বলা হইত। কোনো কোনো ঐতিহাসিক বলেন যে বিজেতারা দেশটিকে 'মিউং ডুন চুনখাম' বা সোনার দেশ বলিয়া বর্ণনা করিত, কিন্তু শান দেশ হইতে আগত বলিয়া তাহাদের আ সাম বা আ হম বলা হইত। তাহার পর শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া ভাবে, ভাষায়, রক্তে কামরূপীয় আর্য সংস্কৃতির বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, বৌদ্ধ বাদের সহিত ক্রমাগত সংমিশ্রণের সুযোগ ঘটিয়াছিল। ফলে বিজেতারা পুরাদস্তুর হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া তাহাদের ধর্ম, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি গ্রহণ করিয়াছিল। অবশ্য বিজেতাদের বংশধরেরা, নানা সংমিশ্রণ সত্ত্বেও তাহাদের নিজস্ব ভাষা কিছুটা রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়া-

ছিলেন এবং তাহারই বর্তমান রূপকে প্রাচীন আ হোম ভাষার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট করিলে বিশেষ ভুল হইবে না। কিন্তু এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, এই আহোম ভাষা বর্তমান বা প্রাচীন অসমীয়া ভাষা নয়। কিছু সংমিশ্রণ হইয়াছে যেমন বুরঞ্জীর ভাষায়, কিন্তু 'অসমীয়া' বলিতে প্রাচীন কামরূপীয অর্ধমাগধীর অপভ্রংশকেই বুঝায়। কারণ এই শানজাতীয় অহমদের আসিবার বহু পূর্বেই, অন্ততঃ সহস্রাধিক বৎসর পূর্বে আর্য সভ্যতা ও কৃষ্টি কামরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, এবং আর্য ভাব, ভাষা ও সংস্কৃতি অনার্য আদিবাসী ও আগন্তুকদের যথেষ্ট প্রভাবিত করিয়াছিল। আর্যরা আসিবার পূর্বে যে অস্ট্রিক, নিগ্রোবটু, ভোটচীনরা আসামে ছিল বা পরে আসিয়াছিল তাহারা সম্পূর্ণ ভাবে আর্যীকৃত আজও হয় নাই একথা সত্য, কিন্তু সমীকরণের চেষ্টা যে চলিতেছিল, বিশেষ করিয়া ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায়, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। অহমদের সম্বন্ধেও এই প্রাকৃতিক নিয়মের ব্যত্যয় হয় নাই। অহম রাজা চুংখাপা ইন্দ্রবংশীয় স্বর্গদেবে পরিণত হইলেন। ষোড়শ শতাব্দীর সূর্য দৈবজ্ঞ লিখিত দরংরাজবংশাবলীতে আছে যে, অসম বলিতে ঐ বিজয়ী শানেদেরই বুঝাইত। সপ্তদশ শতাব্দীর দৈত্যারি ঠাকুরের শংকরচরিতে শান বা আহোমদের নানাভাবে বর্ণনা করা হইয়াছে। কিছু পরে রচিত কামরূপ বুরঞ্জীতে 'আছাম' এই কথাটি পাওয়া যায়। অসম বুরঞ্জীতে উদ্ধৃত (১৬৬৩ খ্রীষ্টাব্দ) মীরজুমলা (মজুম খাঁ) ও অহমরাজের সন্ধিপত্রের যে বিবরণ আছে তাহার বর্ণনা এইরূপ: "লিখিতং শ্রীজয়ধ্বজ সিংহ রাজা আচাম . ."।

ঐতিহাসিকেরা সকলেই স্বীকার করেন যে, আসাম নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে এখনও কোনো সন্তোষজনক মীমাংসা হয় নাই। গ্রিয়ারসন ব্রহ্মদেশীয় শান কথার সঙ্গেই আসামকে জড়িত করিয়াছেন। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী শানকে মনখমের শিলা-লিপির শিনশ্যামের সঙ্গে যুক্ত করেন। তাই ভাষায় চাম বলিতে পরাজয় বুঝাইত। আ চাম বলিলে অপরাজেয় বুঝায়। আসামের সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ডাঃ বাণীকণ্ঠ কাকতি আসমের নামকরণকে phonetic vagary বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আমরা পূর্বেই বলিয়াছি অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষার মতই মাগধী প্রাকৃতের অপভ্রংশ এবং বর্তমানে অসমীয়া সাহিত্য বলিতে আমরা ঐ ভাষায় লিখিত সাহিত্যকেই বুঝি। অবশ্য অহম ভাষায় নিজস্ব কিছু পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে, বুরঞ্জীতেও ও অন্যত্র তাহার নিদর্শনও আছে এবং ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার বাহিরে পার্বত্যজাতিদেরও নিজ নিজ ভাষায় কিছু সাহিত্যিক প্রকাশ আছে। এবিষয়ে খাসিরাই অগ্রণী।

আসামের স্বাধীন নরপতিদের শাসনছায়ায় এবং তাহার সামাজিক জীবনের স্বয়ংসম্পূর্ণতায় অসমীয়া ভাষা একটি স্বাধীন ভাষায় পরিণত হইয়াছিল, যদিও তাহার সগোত্রা উত্তরবঙ্গীয় কথ্যভাষা ক্রমশঃই লিখিত ও সাহিত্যিক বঙ্গ ভাষার বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিল।

মোটকথা, শান জাতির অহম শাখার লোকেদের আগমনের বহু পূর্বেই এখানে অস্ট্রিক, নিগ্রোবটু, বোড়ো, তিব্বতীয় দ্রাবিড় মোঙ্গলীয় এবং আর্যেরা আসিয়াছেন এবং আর্যেরা সুপ্রতিষ্ঠিত ছিলেন। শুধু মগধ গৌড় হইতেই লোক আসে নাই, মিথিলা কনৌজ কাশ্মীর গুর্জর দাক্ষিণাত্য হইতে বৌদ্ধ শ্রমণ আসিয়াছে, তান্ত্রিক কাপালিক আসিয়াছে, সহজিয়ার দল, নাথসম্প্রদায়ীরা আসিয়াছে। তাহার পরেও শিল্পীভাস্করচিত্রকররা আসিয়াছে, গায়কবাদক আসিয়াছে, হাটকেশ্বরের পূজারীরা

আসিয়াছে, নদীয়ার ব্রাহ্মণবৈষ্ণবগুরুরা আসিয়াছে। তাহারা ভারতীয় সংস্কৃতির অন্তরতম সত্তাকে এইখানে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কামরূপ প্রাগজ্যোতিষকে অহমদের ও আদিবাসী ও অন্য আগন্তুকদের সংস্কৃতির সঙ্গে মিশাইয়া একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ সংস্কৃতির বীজ বপন করিয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে আসাম পুরাতত্ত্ব ও অনুসন্ধান বিভাগের কর্মকর্তা ডাঃ সূর্যকুমার ভুইঞার দুই নম্বর বুলেটিন হইতে কিছু মন্তব্যের মর্মার্থ দিতেছি—

আসামের কথ্যভাষা প্রায় এক শ কুড়িটি। অস্ট্রিক, ভোটচীন, দ্রাবিড় ও আর্য-শাখার ভাষা। প্রত্যেকটিই জীবন্ত। অনার্য বিজেতারা ক্রমশই বিজিতদের সংস্কৃতির প্রভাবে আসিয়াছিল এবং তাহারই ফলে একটি মিশ্র সংস্কৃতি ও সামাজিক ব্যবস্থা গড়িয়া উঠিয়াছিল, যাহাকে আর্য রক্ষণশীলতা ও অনার্য অগোঁড়ামীর মিশ্রণ বলা যাইতে পারে—আর্য ও অনার্য ধারা রক্তবাহিকা দুই নাড়ীর কাজ করিতেছিল।.. ফলে এইখানে নূতন স্মৃতিবিধির উৎপত্তি হইয়াছিল, নূতন জ্যোতির্বিদ্যা ও বিজ্ঞান, নূতন ধর্মসাহিত্য, যদিও ইহার গোড়ায় ছিল বৌদ্ধ চিন্তার প্রভাব।

২. অসমীয়া সাহিত্যের শৈশব ও কৈশোর

প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যের কালবিভাগ বিচার করিলে দেখা যায় যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্বে প্রকাশিত শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র গোস্বামী সম্পাদিত 'অসমীয়া সাহিত্যের চানেকী'তে যে বিভাগ নির্দেশ করা হইয়াছিল তাহা আজও গ্রহণযোগ্য। এই বিভাগ অনুসারে অসমীয়া সাহিত্যকে ছয়টি যুগে ভাগ করা যায়—

অসমীয়া সাহিত্যের প্রথমযুগ 'গীতিযুগ'—আনুমানিক সপ্তম শতাব্দী হইতে নবম শতাব্দী পর্যন্ত। এই সময়কার সাহিত্য প্রায়ই অলিখিত। ডাকের বচন, বিহুগান, শিশুদের ঘুমপাড়ানী ছড়া, এই শিশুযুগের নিদর্শন।

অসমীয়া সাহিত্যের দ্বিতীয় যুগ 'মন্ত্র আরু ভনিতার যুগ'—এই সময়েই লিখিত সাহিত্যের জন্ম। ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্যন্ত ইহার কাল নির্দেশ করা যায়।

তৃতীয় যুগের আরম্ভ হইল রামায়ণ পুরাণ প্রভৃতির অনুবাদে—কবি হেমসরস্বতী, মাধব কন্দলী, পীতাম্বর দ্বিজ প্রভৃতি এই যুগের বিশিষ্ট সাহিত্যিক। ইহাকে বলা হইয়াছে—প্রাক্‌বৈষ্ণবীযুগ।

মহাপুরুষ শঙ্করদেবের আবির্ভাবের সঙ্গেসঙ্গে বৈষ্ণবী যুগের আরম্ভ। ইহাকে শুধু বৈষ্ণবীযুগ বলিলে ঠিক পরিচয় দেওয়া হয় না, ইহা হইল নবজাগৃতির যুগ।

তাহার পরের যুগের নামকরণ হইয়াছে বিস্তারের যুগ। এই যুগের সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ হইতেছে গভীরতা কমিয়া গিয়া বিস্তৃতি বৃদ্ধি। এই যুগই রাজা শিবসিংহ, রানী ফুলেশ্বরীর যুগ, মাওমোরিয়া বিদ্রোহের যুগ, বর্মীদের সহিত যুদ্ধ, পতন, গৃহবিবাদের যুগ।

ব্রিটিশ যুগের আরম্ভ হইতে বর্তমান যুগের আরম্ভ। এই যুগের সাহিত্যে ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের প্রভাব প্রচুর।

এই যুগবিভাগকে মোটামুটি মানিয়া লইলেও সুষ্ঠু ইতিহাসসম্মত ও ভাষা-তত্ত্বানুমোদিত বিভাগ অনুযায়ী প্রথম ও দ্বিতীয় যুগ, ও চতুর্থ ও পঞ্চম যুগকে

একত্র বিচার করাই সমীচীন। প্রথম ও দ্বিতীয় যুগের ডাকের বচন, বিহুনাম, কন্যা বারমাহী, গ্রাম্য গীত, আইনাম প্রভৃতি যে নিদর্শনগুলি আমাদের যুগে আসিয়া পৌঁছিয়াছে সেইগুলি ভাষাতাত্ত্বিকের দিক হইতে দেখিলে ইহা সুনিশ্চিত ভাবে বলা কঠিন যে সেইগুলি আদিম যুগেরই রচনা। প্রধানতঃ এই সব গীতি কবিতা লোকের মুখে মুখে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া চলিয়া আসিতেছে। সেইসঙ্গে সমসাময়িক ভাষার পরিবর্তন ও পরিবর্ধন অবশ্যম্ভাবী। তবে এইগুলি অপেক্ষাকৃত পরের যুগের হইলেও প্রাচীন যুগের রূপ বহন করিয়া লইয়া আসিয়াছে, সেইজন্য এইগুলির সাহিত্যিক বিচার আদিম যুগেই নির্ণয় করা হইয়াছে।

ঐতিহাসিকদের মতে আসামে প্রথম সামাজিক গোষ্ঠী গঠিত হয় অস্ট্রিকদের আগমনে। তাহারই উত্তরাধিকারী হিসাবে অনেকে খাসি, জয়ন্তীয়া ও মোরানদের দেখাইয়া দেন। মাতৃতন্ত্রপ্রধান কৃষিগ্রামীণ সভ্যতা অস্ট্রিকদের দান। মাদ্রাজের ডাঃ এরহেনফেলস দক্ষিণ ভারতীয় মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার সহিত আসামের খাসিদের সাংস্কৃতিক ঐক্য আছে প্রমাণ করিয়াছেন। বিহুনাচ ও গান, বৃহৎ প্রস্তর স্তম্ভ (megaliths), প্রস্তর কুঠার প্রভৃতি যন্ত্র এক প্রাচীন মাতৃতন্ত্রবাদের ঐতিহ্যের পরিচায়ক। বিহুনাচ প্রভৃতি উৎসব (বোহাগবিহু, কাতিবিহু, মাঘবিহু) আসামের অতি জনপ্রিয় ও পুরাতন উৎসব। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত রাজমোহননাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয় এই উৎসবগুলিকে অস্ট্রিক যুগের স্মারক বলিয়া মনে করেন। খাসিদের মধ্যে নংক্রম নাচ আজও বিশেষভাবে প্রচলিত। তাঁহার মতে গ্রামীণ ও কৃষি সভ্যতার অঙ্গ স্বরূপ ভূমাতার শস্যদান মানবীয় মিলন, গর্ভধারণ, জন্মদান ইত্যাদি রূপকরূপে কল্পিত হইয়াছে। বৈশাখ মাসে বোহাগবিহু উৎসবে মিলনেচ্ছু যুবক যুবতীরা উন্মুক্ত ক্ষেত্রে শস্যরোপণের পূর্বে কামোদ্দীপক নৃত্যগীতাদি করিত। মাতা বসুন্ধরাকে তাহারা শস্যদানের উপযুক্তা করিয়া তুলিত—অশোকবৃক্ষ রোপিত হইত। অম্বুবাচী বা 'আমাতি' মাতার রজস্বলা হইবার দিন এবং চারিদিন পরে শস্য বপনের দিন। কাতিবিহুতে ভূমাতা শস্যবতী হইয়াছেন, তাহাকে নানারূপ মন্ত্রপূত করিয়া গর্ভস্থ সেই শস্যসন্তানকে নিয়মিত সময়ে গ্রহণ করিতে হইবে। অগ্রহায়ণে শস্য উৎপাদন ও কর্তন শেষ হইলে পৌষের শেষে উত্তরায়ণের প্রথমে মাঘবিহু—মাতা প্রচুর শস্য দিয়াছেন—দীয়তাং ভুজ্যতাং—অগ্নি সংযোগ দ্বারা তাঁহাকে সুস্থ ও সবল রাখা কর্তব্য। তাই দিকে দিকে বহ্ন্যুৎসবের ব্যবস্থা। কিন্তু আবার কোনো কোনো পণ্ডিত বলেন যে ঋগ্বেদেও অতিরাত্র, মহাব্রত ও বিষুবাহু প্রভৃতি যজ্ঞের উল্লেখ আছে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে যজ্ঞকুণ্ডের পাশেপাশে রাত্রির তিন যামে উপাসকরা সোমপাত্র হাতে ঘুরিতেছেন ও মন্ত্রপাঠ করিতেছেন ইহা দেখা যায়—

তুলসীর গোরে গোরে মৃগপাহু ঘুরে।

কালো বড় খর্বাকার কোঁকড়ানো চুল, নাক চ্যাপটা, ঠোঁটপুরু, নিগ্রোবটুর রক্ত আসামের নাগাদের মধ্যে কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। নাংগা বলিতে স্বর্গ হইতে আগত বোঝায়। বর্শা, দা, শাঁখ, কড়ি, চিত্রবিচিত্র শিরোভূষণ নাগাদের বৈশিষ্ট্য। আঙগামীরা হাতির দাঁতের কাজে সুপটু। ইহারা আদিম প্রস্তরাস্ত্র যুগের (eolithic) মানুষ। শিকার ও কন্দমূল খুঁড়িয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। তাহাদের ভাষার কোনো চিহ্ন পাওয়া যায় নাই। প্রাগৈতিহাসিক কালে তাহার পর আসামে প্রবেশ করিয়াছিল প্রটোঅস্ট্রেলয়েডরা। ইহারা ব্রহ্মপুত্রের গতি ধরিয়া

আসামে প্রবেশ করিয়াছিল। ইহারা পূর্ব হইতে আসিয়াছিল কি পশ্চিম হইতে, সে বিষয়ে পণ্ডিতদের উপরই বিচারের ভার রহিল। এক শাখা মেডিটারেনীয়ান বা ভূমধ্যসাগরীয় এবং প্রটোস্‌মেরীয়ান সভ্যতার সহিত সংশ্লিষ্ট। আর একদল ব্রহ্ম-দেশের মন্‌ বা তালৈংগদের সমগোত্রীয়। অস্ট্রিক গোষ্ঠী ভাষার মধ্যে আসামে খাসিয়াই প্রধান। আজও মুখে মুখে লৌকিক সাহিত্য হিসাবে খাসিয়া ভাষার প্রসার ও প্রচার আছে। কিন্তু অস্ট্রিকভাষা ভারতের সর্বত্রই আর্যীকরণের প্রভাবে পড়িয়াছিল। তাহার পর আসিয়াছিল দ্রাবিড়ভাষাভাষীরা—দীর্ঘকপাল ভূমধ্যসাগরীয় ও হ্রস্বকপাল আর্মেনয়েডরা। মহেঞ্জদড়ো ও সিন্ধু সভ্যতার ধারক ও বাহকরূপেই ইহারা ভারতবর্ষে সুপরিচিত। পরবর্তীযুগে ভোটচীনরাও আসামে প্রবেশ করিয়াছিল। আসামের গারো, লুশাই ও বোডো জাতি এই গোষ্ঠীভুক্ত। তাহাদের ভাষা ক্রমশই বাংলা ও অসমীয়ায় মিশিয়া যাইতেছে। সাহিত্য নাই বলিলেই হয়। মহাভারতে আমরা শিবোপাসক কিরাত জাতির কথা পড়িয়াছি। ভারতীয় সাধনার ইতিহাসে ও তান্ত্রিক উপাসনার বিকাশে শিবশক্তি পূজার স্থান কোথায়, সাহিত্যের পরিচয়ে তার বিচার গৌণ। প্রাক্‌-অহোম যুগের কাছাড়ি, চুতিয়া, বারভুঞাই প্রভৃতি ঘোর শাক্ত ছিলেন। কাছাড়ির ব্রা বি, চুতিয়ার কেছাইখাতীর তাম্রেশ্বরী, আর বারভূইঞার আইগোসানী প্রাচীন মাতৃতন্ত্রাবাদ, শৈববাদ ও আধুনিক তন্ত্রবাদের সংগে মিশিয়া এক সংকর ধর্মের উৎপত্তি করিয়াছিল। দেবী কামাখ্যার অভ্যুদয়ও এই সমীকরণের প্রকাশ। শ্রদ্ধেয় রাজমোহননাথের মতে ইনি অস্ট্রিক ভূমাতা 'কা মাই খা'।

ইতিহাসের কথা ছাড়িয়া দিয়া ভাষার দিক হইতে দেখিলে অসমীয়া ভাষা বাংলা ভাষার মত প্রাচীন মুণ্ডাকোল মনখমের ভোটব্রহ্ম নরগোষ্ঠী(কিরাত)র ভাষা প্রভাবিত প্রাচীন আর্যভাষার অপভ্রংশ ও জটিল সংমিশ্রণ। মধ্যভারতীয় সংস্কৃত "উদীচাখণ্ডে"র ভাষা এবং এই ভাষার সংগে কিছু পার্থক্য ছিল। পতঞ্জলিও তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন, যেমন ব-এর স্থানে ল-এর ব্যবহার। আচার্য লেভির মতে এই বৈশিষ্ট্য মুণ্ডা মনখমের ভাষা-পরিবারের। একটি কথা মনে রাখা আবশ্যক যে, সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে সাহিত্যে ভাষায় যে গৌড়ী-রীতির কথা পড়ি, যাহা ভামহ ও দণ্ডী স্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন, যাহাকে বৈদর্ভী রীতির বিদ্রোহ বলিয়াই ধরা যাইতে পারে এবং যাহাকে বাণভট্ট মাত্রার আড়ম্বর (অক্ষরডম্বর) বলিয়া শ্লেষ করিয়াছেন তাহা কামরূপেও প্রচলিত ছিল। ভাস্করবর্মার নিধানপুর তাম্র-শাসন সেই অলংকৃত রীতির প্রথম পরিচয়। সমুদ্রগুপ্তের লিপিতে কামরূপ-বিজয়ের কথা আছে। কালিদাসের রঘুর দিগ্বিজয়েও কামরূপের নাম পাই। মহাভারতে নবক ও ভগদত্তের বিবরণ আছে। রুক্মিণী-হরণের কাহিনী সাহিত্যে পাইলেও ইতিহাসে পাইনা। গুপ্তদের সময়ে প্র্যাগ্‌জ্যোতিষভুক্তি সম্রাটের শাসনাধীন একটি প্রদেশ। 'মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং' গোপাল যখন প্রকৃতিপুঞ্জের অনুমোদনে সিংহাসন আরোহণ করেন তখন ও তাঁর পুত্র ধর্মপালদেবের সময়ও কামরূপ গৌড়-সাম্রাজ্যভুক্ত বলিয়াই মনে হয়। কথিত আছে যে, কুমারপালদেবের মন্ত্রী বৈদ্যদেব কামরূপ বিজয় করিয়া সেখানে রাজা হইয়াছিলেন। কবি শরণের কবিতায় লক্ষ্মণসেনদেবের কীর্তিবর্ণনায়ও কামরূপের উল্লেখ পাই—

ভ্রূক্ষেপাদ্‌ গৌড়লক্ষ্মীং জয়তি
কেলিমাত্রাৎ কলিঙ্গান্‌
বিনয়তে কামরূপাভিমানং

মান্দাসরে বর্ণিত রাজা যশোধর্মের সাম্রাজ্যও কামরূপ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলিয়া মনে হয়। রাজ্যমতীর পিতা হর্ষদেব ভগদত্তবংশজাত বলিয়া খ্যাত এবং তাঁহার স্বামী লিচ্ছবী রাজ দ্বিতীয় জয়দেব গৌড়, ওড্র, কলিঙ্গ, কোশলাধিপতি ছিলেন বলিয়া প্রকাশ। কুমারিলের তন্ত্রবার্তিককে ৮০০ শত খ্রীষ্টাব্দের গ্রন্থ বলিয়া পণ্ডিতগণ ধরেন। ইহার তৃতীয় পটলে তন্ত্রবিদ্বেষক বর্জনীয় ব্যক্তির বর্ণনায় কামরূপ ও কলিঙ্গের নাম আছে। তন্ত্রসারেও কামরূপের উল্লেখ আছে—মূলাধারে কামরূপং আবার নবরত্নেশ্বরে কামাগির্যালয়ে মিত্রীশনাতাত্মকের পূজা আছে। যেমন জালন্ধর পীঠের নায়কের নাম ষষ্ঠীশনাথাত্মক। এই প্রসঙ্গে নাথ নামটি প্রণিধানযোগ্য।

কালিকাপুরাণে বর্ণিত আছে যে নরক বিদেহরাজ্যে প্রতিপালিত হইয়াছিলেন এবং প্র্যাগ্জ্যোতিষপুর জয় করিয়া কিরাতরাজ ঘোটককে নিধন করেন। শ্রীযুক্ত পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদের মতে পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে কামরূপে বহু ব্রাহ্মণ ও কায়স্থের বাস ছিল। কামরূপের এক একটি গ্রামে প্রায় দুইশত ব্রাহ্মণ বাস করিত। হিউয়েনচাঙ শতশত দেবমন্দির দেখিয়াছিলেন এবং মিথিলায় কথিত ভাষার সহিত কামরূপের ভাষার যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিয়াছিলেন। নিধানপুর তাম্র-শাসনে ভাস্করবর্মাকে প্রকৃষ্ট আর্যধর্মের রক্ষক বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

হেমকোষে আসামকে বলা হইয়াছে কলিতা বা কুললুপ্তের দেশ। এইরূপ কিম্বদন্তী আছে যে পরশুরাম যখন ক্ষত্রিয়নিধন যজ্ঞ আরম্ভ করেন তখন জামদগ্নিরোষ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য অনেক ক্ষত্রিয় নিজেদের কলিত বা কুললুপ্ত বলিত।

হিউয়েনচাঙএর ভ্রমণকাহিনী, বাণভট্টর হর্ষচরিত, তৎকালীন শাসনমালা কামরূপাধিপতি ভাস্করবর্মার সম্বন্ধে যথেষ্ট তথ্য সরবরাহ করে। ভাস্করবর্মা 'শশিশেখরপ্রিয়পিনাকিন'এর ভক্ত, অর্থাৎ শৈব ছিলেন বলিয়াই মনে হয়। বরাহরূপী নারায়ণের কথাও তাঁর লিপিতে পাওয়া যায়, এবং তিনি যে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন তাহারও প্রমাণ আছে। হর্ষবর্ধনকে তিনি যেসমস্ত দ্রব্য উপহার দিয়াছিলেন তাহা হইতে তৎকালীন কামরূপের একটা সুসংগত চিত্র পাওয়া যায়—হালালি সিল্কের জামা, অতি মোলায়েম চামড়া, একটি মণিমাণিক্যখচিত ছত্র, অতি সুন্দর বৃক্ষত্বকের উপর লিখিত ও খোদিত পুস্তক, অগুরু চন্দন মৃগনাভি চিত্রিত ও মসৃণ মাদুর, স্বর্ণপিঞ্জরে হংসমিথুন, অতি মিহি সুতা ও মুগার পট্ট বস্ত্র, পনস, নারিকেল ও এক কলসী তরল গুড়।

বর্মণ-বংশের ভাস্করবর্মাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ নরপতি ছিলেন। বর্মণবংশ, ম্লেচ্ছবংশ, পালবংশ চতুর্থ শতাব্দী হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত কামরূপে রাজত্ব করেন এবং ইঁহারা সকলেই নরক ভগদত্ত হইতে অর্থাৎ অসুর বংশ হইতে উৎপত্তি গণনা করিতেন। শালস্তম্ভ বংশের রাজারা কামেশ্বর মহাগৌরীর উপাসক ছিলেন। কামাখ্যা ও হাটকেশ্বরের মন্দির তাঁহারাই নির্মাণ করেন। ঐসব মন্দিরে দেব-দাসীদের উৎসর্গ করা হইত! শঙ্করবিজয় গ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছে যে শঙ্করাচার্য কামরূপ আসিলে অভিনবগুপ্ত তাঁহাকে তান্ত্রিক অভিচার ক্রিয়ার দ্বারা অসুস্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। মীননাথ প্রভৃতি কাপালিক সিদ্ধদের কথাও কামরূপে শোনা যায়। সহজিয়া সাধনও প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। নিধানপুর তাম্রশাসনের তিন শত বৎসর পরে ধর্মপাল বর্মদেবের তাম্রশাসনে অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা দেখি। তাঁর গলার একদিকে দোলে লীলাপদ্ম, অন্যদিকে উদ্যতফণা ফণী, তাঁর বরবপুর একদিক স্তনভারনম্র আর একদিক ভস্মাচ্ছাদিত, যিনি শৃঙ্গার ও রৌদ্ররসের প্রতীক।

এই যুগের সাহিত্য মৌখিক জনসাহিত্যেই পর্যবসিত ছিল। অবশ্য কিছু কিছু গান লোকপরম্পরায় গীত হইয়া আজিকার যুগে নামিয়া আসিয়াছে, যেমন—

ও কনি সখী মরি গল বগে বরত করে;
লুইত ফেনা, মহ ফেনা, গছ নিপাতী
কপৌ কণা..

বা মণিকোঁৱৰ ফুলকোঁৱৰ গীত

শংকলদেব রজারে পুতেক মণিকোরর,
কোলাতে খতিখুন নাই..

শংকরদেবের উল্লেখে অনেকে ইহাকে বৈষ্ণবীয় যুগের বলিয়াই মনে করেন।

বৌদ্ধচর্যাপদ, ডাকের বচন প্রভৃতি অনেকে অসমীয়া ভাষার ও সাহিত্যের পূর্ব-রূপ বলিয়া দাবী করেন।

সরহপা, লুইপা, মীনপা, গোরক্ষপা, কানপা, তিল্লপা, তান্ত্রিপা, কক্কুরী, ভুসুক্, ডোম্বী প্রভৃতি চৌরাশী সিদ্ধাইদের বচনকে অসমীয়ার পূর্বরূপ বলিব কিনা এ বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। লামা তারানাথের গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে মগধগৌড় দেশ হইতে বিতাড়িত অনেক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী পূর্বাঞ্চলে কুকীদের রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করে। তাহারাই যে ঐদেশের ভাষা ও সাহিত্যের কিয়দংশ সংগে লইয়া আসে নাই তাহা কে বলিতে পারে? তেংগুর নামে তিব্বতীয় গ্রন্থে একটি বচন পাওয়া যায়—

গংগা যমুনার মাঝে যে বহই নাই
তঁহি চঁড়ালি মাতংগ

গংগা ও যমুনার উল্লেখে মনে করিবার যথেষ্ট সংগত কারণ আছে যে শৌরসেনী অপভ্রংশ ভাষার জন্ম কামরূপের বাহির্ভাগে। সরহ ও কাহ্নের দোহা বা ডাকার্ণব শৌরসেনী অপভ্রংশে রচিত। এই শৌরসেনী আধুনিক কালের বাংলা ও অসমীয়া দুইয়েরই জন্মদাত্রী। লিপি হিসাবে অসমীয়া ও বাংলার ভিতর মোটেই প্রভেদ নাই। শুধু কুটিলা রীতি। সমাচারদেবের কোটালিপাড়া তাম্রশাসন, মহীপালের বাণগড় লিপি ও বিজয়সেনের দেওপাড়া প্রশস্তি বাংলা অক্ষরের প্রথম চিহ্ন। আর্য মঞ্জু শ্রীমূলকল্পের মতে বংগসমতট হরিকেল গৌড় ও পুণ্ড্রের লোকেরা "অসুর" ভাষাভাষী। নরক ও ভগদত্ত অসুরবংশজাত। ইরানীয় "আহুরে"র সহিত কোনো সংস্কৃতিগত সম্পর্ক বাংলা ও কামরূপের ছিল কিনা জানা নাই।

গ্রিয়ারসন সংগৃহীত মানিকচন্দ্রের গান, ফয়জল্লাকৃত গোরক্ষবিজয়, শুকুর মামুদের গোপীচন্দ্রের গীত, শ্যামাদাসের মীনচেতন, ভবানীদাসের ময়নামতীর গান, তৎকালীন নাথধর্মের জয়পতাকা বহন করিয়া সাহিত্যে অভিব্যক্ত। ডাঃ শহীদুল্লাহের মতে হিন্দী মারাঠী, ওড়িয়া প্রভৃতি ভাষায় নাথ-গীতিকা পাওয়া যায়। তিব্বতীয় ভাষায়ও আছে। সেইজন্য অসমীয়াতেও নাথ-সাহিত্য বিদ্যমান থাকিবে তাহা আশ্চর্য নয়। কিন্তু বাংলা লিপিতে লিখিত সব নাথ-সাহিত্যই অসমীয়া সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত, এবং ইহাই অসমীয়া সাহিত্যের প্রাচীন রূপ, এই দাবী কতটা যুক্তি-সংগত তাহার সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ আছে। বৃহত্তর কামরূপের সাংস্কৃতিক পরিধির মধ্যে ময়মনসিংহ, রংপুর ও উত্তরবংগের অনেকটা যুক্ত ছিল এবং ভাব ও

ভাষার দিক দিয়া একই মূল উৎস হইতে তাহারা রসপান করিত। অসমীয়া ও বাংলা ভাষার মধ্যে ঐক্য ও সাহিত্যে বিষয়বস্তুর একতা প্রধানতঃ এই কারণে। অসমীয়া গীতের নায়কও গোপীচন্দ্র—

মএনামতির বিআও হইল মাণিকচন্দ্রের ঘরে
সিন্দুরমতির বিআও হইল নিলমণি রাজার ঘরে।
মএনাক বিআও করি পঞ্চাশ বিআও করে
বুঢ়া দেখি মওনামতির ব্যালগ করি দিলে।

অসমীয়া সাহিত্যের আদিম নিদর্শন গান, বচন, দোহা, মন্ত্র ভণিতাগুলি। জনসাধারণের মুখে মুখে এইগুলি গীত হইত এবং পরে লিপিবদ্ধ হয়। ইহাতে তখনকার দিনের পারিবারিক সামাজিক রীতিনীতি ব্যবস্থাবিধানের একটা সুন্দর চিত্র পাওয়া যায়। মানুষের মনে সীমাবদ্ধ যে ভাবগুলি ঘোরাফেরা করে সেইগুলির স্বচ্ছ সরল সহজ প্রকাশ এইসব গ্রাম্যকবির প্রাচীন পদগুলিতে। 'ধাইনামে' দেখি—

আমাকে মইনা শুব এ

আমায় ময়না শুইবে,

আমারে মইনা হালিছে জালিছে
কালি দুপুরের ভাতে।
ভাত খাই মইনা দোলত উঠিলে
পানি খাই মইনা শোবে।
তামোল খাই মইনা সেলেংগ লাগিলে
দোলা কাতি হৈ পবে।

সেই যে গ্রাম্য কবির ময়না, যে 'এতিয়াই গরু লই যাব এ' সে দ্বিপ্রহরে ভাত খাইল, জল খাইল, শুইল, দোলার উপর কাত হইয়া পড়িল—এই যে সহজ জীবনের সরল অভিব্যক্তি সামান্য কথায় সেগুলি অপরূপ হইয়া উঠিয়াছে।

'লবা শুও্বানাম'এ দেখি আবার সেই প্রাণের প্রিয় ময়না—

ধেনু চারি মইনা মোর গুচাইলেক আঁত
বদ পাই জিলিকিছে মুকুতার দাঁত।
দৈ থৈছো দুগ্ধ থৈছো থৈছো আরু লারু
শুবর শয্যা পারি থৈছো তাতে থৈছো গারু॥

মুকুতার মত দন্তপাটি চিরকালই রসিক সাহিত্যের মনোরঞ্জন করিয়াছে। দধি দুগ্ধ লাড়ু তাহার ভোজনবিলাসকে পরিতৃপ্ত করিয়াছে। শুইবার শয্যা তাহার আরামকে ঘনীভূত করিয়াছে।

কবি রসিক, বলিতেছেন—

ফুলি আছে গোলাপফুল,
নে ভাঙ্গিবা দাল।
আমার মইনা বহি আছে
দেখিবলৈ ভাল।

গোলাপফুলের সঙ্গে আমার ময়না তুলনীয়, গোলাপফুলের মতই সে দেখিতে ভালো।

ধূলে ধূলে ধূলা লাগি পরে,
ধূলা লাগিল গাটি
আইকন হল কাতি

গায়ে ধূলা লেগে আমার ময়না ধূসর হইয়া উঠিয়াছে। খাদ্য কি—প্রিয় খাদ্য হইতেছে নোনামাছ ও ভাত—

চৈ চৈ এ চিঁচৈ পোবালী
লোনে মাছ ভাতখাই কি কৈ খিনালি

নৃত্য তাহাদের অতি প্রিয়—

নাচ বাই জেতুকী এ
ভরি মেলি মেলি নাচ

'গরখীয়া নামে' দেখি কবি তার প্রিয়াকে বলিতেছেন—

ধানো খামো, চাউলো খামো,
তোক বিয়া করাই ঘর লৈ যাম

শুধু ধান খাব, চাউল খাব নয়, বিবাহ করিয়া ঘরে লইয়া যাইব।

তেলীয়ে দিব তেল, খারনী মালীয়ে দিব ফুল

তেল ও ফুল সংগ্রহ হইবে আর বসিবার জন্য বড় পিঁড়িও তাতে বসিয়া বসিয়া রথ দেখা যাইবে—

আনি কাটি জ্বালি দিম
বড় পিড়া পারি দিম
তাতে বহি বহি রদ দে॥

চন্দ্রাবল্লীর উপাখ্যান অতি মনোরম। চন্দ্রাবলী ধনী বণিকের কন্যা, অর্থ ও ঐশ্বর্যের মধ্যে লালিতা। কিন্তু বিধাতার বিধানে তাহার কপালে লিখিত ছিল যে, তাহার স্বামী হইবে এক অতি সাধারণ গ্রাম্যযুবক। কাথিয়া নামে এক দরিদ্র যুবক চন্দ্রাবলীকে দেখিয়া তাহার প্রেমে পড়ে এবং তাহাকে জানায় চন্দ্রাবতীর ইহাই ললাটলিপি। চন্দ্রাবলী তাহার স্পর্ধা দেখিয়া তাহাকে কঙ্কণ ছুড়িয়া মারে। কিন্তু মনে মনে সে শঙ্কিত হয় যে সত্যই যদি ইহা বিধাতার ইচ্ছা হয় তাহা হইলে দৈবকে সে প্রতিরোধ করিবে কিসে। সেই জন্য লোকচক্ষুর অন্তরালে অতি নির্জনে সে বসবাস আরম্ভ করে। কাথিয়াও সংসার ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায়। বহুবর্ষ পরে ঘুরিতে ঘুরিতে একদিন সেই যুবক না জানিয়া চন্দ্রাবলীর প্রাসাদে আসিয়া উপস্থিত হয়। চন্দ্রাবলী প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারে না, কিন্তু পরে ললাটে

কঙ্কণাঘাতের চিহ্ন দেখিয়া ইহাই নিজের ললাটলিপি ও নিয়তির খেলা বুঝিয়া আত্মপরিচয় দেয় ও আত্মসমর্পণ করে। তারপর

ঘাষিবাকা দিলা আনি গন্ধপুষ্পতেল
গাধুবাকা দিলা আনি উত্তম গঙ্গার জল।
বসিবাকা দিলা আনি গামেরির পিড়া
ভোজনাত দিলা আনি মালভোগ ধানের চিড়া॥

খাইয়া দাইয়া অতিথি বাপু শয়ন করিল।

গাত্রমার্জনের জন্য গন্ধপুষ্পতৈল, স্নানের জন্য উত্তম গঙ্গাজল, খাইবার জন্য উৎকৃষ্ট মালভোগ ধানের চিড়া, সমাজবিন্যাসের উচ্চস্তরেরই পরিচয় দেয়।

গহনার তালিকায় দেখি, শুধু হার টার বা সাতসরী নয়, দেবতাদের অঙ্গের যেসব ভূষণ আছে তাহাও—

হার পিন্ধে, টার পিন্ধে, পিন্ধে সাতসরী
দেবাঙ্গভূষণ পিন্ধে ইন্দ্রে দিছে আনি।

আবার ফুলের সাজও আছে—

সেউতী পিন্ধিছে, মালতী পিন্ধিছে,
পিন্ধিছে খড়িকা জাই
সেউতীর এচাকি, মালতীর এচাকি,
আরু চম্পাকলির চাকি।

এই বিয়ানাম কবিতাগুলিতে আমরা 'হরগৌরীর বিয়া', 'রামসীতার বিয়া', 'কৃষ্ণ-রুক্মিণীর বিয়া', 'ঊষা-অনিরুদ্ধর বিয়া'র কাহিনী পাই।

হরগৌরীর বিবাহে কিন্তু দেখি যে লক্ষ্মী-সরস্বতীও আসিয়াছেন—

লক্ষ্মী সরস্বতী দুই ভনী আহিছে
হররে অলঙ্কার লৈ।

কিন্তু বর মহাদেব—তাঁর কি দুরবস্থা, বারো বছর তিনি গা ধোন নাই, গন্ধে প্রাণ যায় আর কি—

কৈলাসৰে পরা মহাদেউ আহিছে
বৃষভ বাহনত উঠি।
আজি বারো বছর বাহি গা ধোৱা নাই
গন্ধে প্রাণ যায় ফুটি॥
শিব আহি পালেহি হেমবন্তর ঘর
ভাঙ্গ খুন্দা সজুলিরে জুলিরে নগর।

কৃষ্ণরুক্মিণীর বিবাহ, ঊষা-অনিরুদ্ধের কাহিনী অসমীয়া সাহিত্যে অতি প্রাচীন কাল হইতে স্থায়ী স্থান করিয়া লইয়াছে। রুক্মিণীহরণ, কুমরহরণ প্রভৃতি কাব্য ও নাটকের বহু পূর্বে বিয়ানাম প্রভৃতি গ্রাম্য কথা ও কাহিনীতে এই আখ্যান-গুলি অমর হইয়া জনচেতনায় ভাস্বর হইয়া আছে।

বিয়ানামের পরবর্তী যুগের কবিরা বাণকন্যা ঊষাকে কেন্দ্র করিয়া একাধিক 'কুমরহরণ' কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। চন্দ্রভারতী রচিত একটি 'কুমরহরণ' কাব্য পাওয়া যায়। অনেকের মতে কবি অনন্ত কন্দলীই ইহার রচয়িতা, ইঁহার অপর নাম ভাগবত ভট্টাচার্য। শোণিতপুরে (বর্তমান তেজপুর) বাণরাজার রাজত্ব ছিল বলিয়া জনশ্রুতি। তিনি পরম শিবভক্ত ও ভক্ত প্রহ্লাদের বংশীয়। তাঁহার পরমা সুন্দরী কন্যা ছিল, তাহার নাম ঊষা—

ঊষাব রূপের উপমার ঠাঁই নাই
যেহি অঙ্গে দৃষ্টি পরে তাকে থাকে চাই।

ঊষার সখি ছিল চিত্রলেখা, সে শিবের কাছে বর পাইয়াছিল—

সুরাসর নর যত আছে চৈদ্য ভুবনত
রূপগুণ জানিবো সবার।
চিত্রতে লিখিবো যত বর্ণভেদ স্বরূপত
যতেক ব্রহ্মাণ্ড চরাচর॥

বিয়ানামের কবি যে কথা বর্ণনা করিয়াছিলেন। 'কুমরহরণের' কবি আরো রসসিঞ্চিত করিয়া সেই কথা বর্ণনা করিলেন—

বৈশাখ মাসত আসি তিথি শুক্লা দোয়াদশী
সেহিদিন দেখিবা সপন।
সুন্দর পুরুষে আসি আলিঙ্গবে হাসি হাসি
তোর স্বামী হৈবে সেহিজন॥

অসমীয়া কবি হরিবংশ হইতে এই আখ্যান গ্রহণ করিয়াছেন, এবিষয়ে সন্দেহ নাই; কিন্তু গল্প হিসাবে ইহাকে সম্পূর্ণ অনুসরণ করেন নাই। আঙ্গিক ও রচনাশৈলীও মূল হইতে পৃথক। গল্পের বিষয়বস্তু হইতেছে যে, হরপার্বতীর বিহার দেখিয়া সদ্যযুবতী সুন্দরী ঊষার কামপীড়া হয়। মহাদেবী সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে বর দেন যে সে স্বপ্নেই মনোমত পতির দেখা পাইবে ও পরে তাহাকে লাভ করিবে—

নিদ্রাং ন ভজতে রাত্রৌ ন দিবা ভোজনং তথা
সা বালা মোহিতা রাজন্ কামেন পরিপীড়িতা।
সপোনত কামে ধরে শরীর বিকল করে
ধরিবারে চাবই আঙ্কোরালি।

কামমোহিতা যুবতী প্রিয়জনকে স্বপ্নে আঁকড়াইয়া ধরিতে যায়। অসমীয়া কাব্যের ঊষা পরিপূর্ণযৌবনা হইলেও সদ্যমুকুলিকা। কবির বর্ণনা কামায়নপ্রচুর হইলেও সুন্দর ও রসসিঞ্চিত—

ঊষা বোলে প্রাণসখী স্বপ্নত আছিলো দেখি
পুরুষেক ত্রৈলোক্য মোহন।
চারু শ্যামকলেবর দিব্য পীত বস্ত্রধর
রুচিকর কমললোচন॥..

পিয়াই অধরমধু মনক হরিয়া মোর
নজানো লুকাই কোথা যাই।
তাংক মই স্বামী বুলি বিচাবহোঁ বিয়াকুলি
সখি মোক দিয়োক্ দেখাই॥
পেলাই কামসমুদ্রত কিবা দোষ দেখি মোত
ত্যজি গৈলা সিটো প্রাণনাথ।
না পাও যেবে তাংক স্বামী নিশ্চয় মরিবো আমি
সখি সত্য কহিলা তোমাত॥

যখন চিত্রলেখা সুর গন্ধর্ব বিদ্যাধর সকলের পট আঁকিয়া বৃষ্ণিবংশের অনিরুদ্ধের পট আঁকিতে লাগিল তখন 'লাজে মুখ বস্ত্রে ঢাকি' ঊষা বলিল—

মোর প্রাণনাথ এহি জন
দেখা কেনে মূর্তিমন্ত ভুবনমোহন কান্ত
কোন নারী ধরিবেক মন।

তারপর ঊষা-অনিরুদ্ধের মিলন, তাহাদের নিত্য বিহার, গোপন আলাপ আপ্যায়ন প্রভৃতি কবি জয়দেবের শৃঙ্গার বর্ণনাকেই স্মরণ করাইয়া দেয়।

পীতাম্বরের 'ঊষা পরিণয়'ও এই শ্রেণীব একটি কাব্য। কিন্তু স্থানে স্থানে উৎকট মাত্রায় লৌকিক হইয়া পড়িয়াছে—

দেখিয়া কুমারী ঊষা গুণে মনে মনে
ধন্য নারী পুরুষ বিলাস করে বনে।
হেনয় সময়ে যার কোলে নাহি পতি
অকারণে প্রাণ ধরে সেহি সে যুবতি॥
বসন্ত সময়ে যার কোলে নাহি পতি
কলসি বান্ধিয়া জলে মরোক যুবতি।

কন্দলীর রামায়ণও বহুস্থানে কামায়নপ্রচুর—

স্বভাবে বরিষা কাল কাম অতিরেক
একগোটা দিন যাই এক বরিষেক
বাখেরে বোলন্ত লখাই নমহে পরাণ
শরীরক দহে মদনের পঞ্চবাণ।

চিত্রকূট-বর্ণনার সময় মদনের পঞ্চবাণ স্ত্রীপুরুষকে কিরূপে ব্যাকুল করিয়াছে তাহার চিত্র আছে।

সমসাময়িক মহাভারতের অসমীয়া কবিও তার বর্ণনাকে কামায়নপ্রচুর করিয়াছেন। ইহা ছিল সহজ জীবনের সরল অভিব্যক্তি—দোষের কিছু ছিল না।

স্বভাবে শোভন অপেস্বরাগণ
মদনচকিত ভাব
উন্নত কঠিন ঘনপীনস্তন
তার অবনত গাব

সহজে চণ্ডালি মদনে বিকলি
নির্ভয়ে তরুণীজন
কামভার পাশে রতিরঙ্গ বসে
করে প্রভু স্মরণ
তান নখে ক্ষত সুরত রেকত
নাগর প্রভুর সঙ্গে
খোপা সুলকিল কুসুম খসিল
নির্ভর সুরতি রঙ্গে।

শুধু তাই নয়—

তিনি চারি নারি হাতে হাতে ধরি
পথতরঙ্গে লবরে..
মান পরিহরি কেহো বরনারী
চলিগৈলা প্রভু থানে
ঘোর কামবাণে দুঃসহ সন্ধানে
সহিব কার পরাণে।

নরনারীর মিলনকে কেন্দ্র করিয়া যুগে-যুগান্তরে দেশে-বিদেশে পূর্বরাগ মিলন বিরহ বেদনা লইয়া রসোজ্জ্বল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে। কবির মন সেখানে একান্তমুখী সৃষ্টিতেই ব্যস্ত। সেখানে সেইসব চিত্র সমাজের নীতির পরিচায়ক এই কথা শুধু আংশিকভাবে সত্য। তাই সাহিত্যের বা শিল্পের ঐ কামায়নপ্রচুর নিদর্শনগুলি লইয়াই জাতির নৈতিক মেরুদণ্ডের মান বিচার করা চলে না। অসমীয়া সাহিত্যেও স্থানে স্থানে রসসমৃদ্ধ গাঢ় দেহজ প্রেমের বর্ণনা পাই। পড়িয়াই যেন না সিদ্ধান্ত করি যে সেই সাহিত্যে কামগন্ধ আছে এবং তৎকালীন সমাজে ইহার প্রাচুর্য ছিল। বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃত সাহিত্যের তুলনায় অসমীয়া সাহিত্য এ বিষয়ে বেশীরকমের নির্দোষ। তখনকার দিনের কবিরা নরনারীর মিলনকে সহজভাবেই গ্রহণ করিতেন, বিশেষতঃ বৈষ্ণব কবিরা কাব্য রচনা করিতেন রসসৃষ্টির জন্য নয়, ধর্মপ্রচারের জন্য ও ভগবদ্ভক্তি প্রাণোদিত হইয়া। তাই দেহাতীত sublimation-এর চেষ্টা ছিল। শেষপর্যন্ত 'চক্রীকৃত চারুচাপ' বিফলই হইত। বীরাসন শিথিল করিয়া ভগবানের তৃতীয় নেত্র 'ভস্মাবশেষং মদনং' করিত।

বিহুগীতও বেশী ভাগই আদিরসাত্মক। পূর্বেই বলিয়াছি, কোনো কোনো ঐতিহাসিক বোহাগবিহু, কাতিবিহু, মাঘবিহু উৎসবকে অস্ট্রিক ভূমাতার উৎসব বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ ইহার মধ্যে ঐতরেয় মহাব্রত বিষুবাহু প্রভৃতি যজ্ঞের ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পান, যেমন কাতিবিহু অশ্বিনদ্বয়ের উপাসনা ও ত্রিযামা রাত্রের এক এক যামে সোমপানের উৎসব, মাঘবিহুতে অগ্নির সংবর্ধনা ও পিষ্টক উৎসবের অনুষ্ঠান।

বিহুসাহিত্যের কয়েকটি উদাহরণ নিম্নে দিতেছি—

ওপর উড়ি যায় কালিন্দী ভোমোরা
ঠিয় হৈ আছিলো চাই।
তোমারে আমারে পিরীতি লাগিলে
চকুরে চকুরে চাই।

প্রথম প্রণয়ের রীতিই হইতেছে চক্ষুতে চক্ষুতে চাওয়া—চারি চক্ষের সলজ্জ মিলন। কালিদাসের উপমায় বলিতে গেলে—

পপৌ নিমেষালসপক্ষ্মপংক্তি
রুপোষিতাভ্যামিব লোচনাভ্যাম্—

দেখিয়া দেখিয়া তৃপ্তি নাই—নয়ন ন তিরপিত ভেল—চক্ষু উপবাসী।

সজাত বন্দী হল, সজারে মইনা
শালত বন্দী হল হাতী।
মকরা জালতে মোর ধন বন্দী হল
টোপনি নাহে মোর রাতি॥

সবাই বন্দী হয়, হাতীশালে হাতিও, কিন্তু কোন্ জালে আমার হৃদয়ধন বন্দী হইল।

ধন যেন দেখোঁ মই তোমাকে বহনা,
প্রাণ যেন দেখোঁ মই তোমাক।
কেচা ঘুমতিত হেবাই যেন দেখিলো
কাক পাই তেজিল আমাক॥

কাহাকে পাইয়া প্রিয় আমাকে ত্যাগ করিল। চিরবিরহিণীর এই বিয়োগব্যথা বিহুলোকসাহিত্যকে রসলোকে পৌঁছাইয়া দিয়াছে।

পূর্ববঙ্গে ও আসামে নৌগীতি প্রসিদ্ধ। এর ঐতিহ্যও বহুদিনের। আসামে ইহাকে বলা হয় 'নাওখেলোবা' গীত। পূর্ববঙ্গে বিশেষ করিয়া ময়মনসিংহ ও আসামে মলুয়ার গীত শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সুখে দুঃখে উত্থানে পতনে নিরক্ষর গ্রাম্যজনকে মুগ্ধ করিয়া আসিয়াছে, বেদনাচঞ্চল প্রেমহিল্লোলে রোমাঞ্চিত করিয়াছে। মলুয়া গীতির অসমীয়া ও বাংলা দুইরূপই আছে এবং বিশেষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে ইহাদের মধ্যে ভাষাগত, বিষয়গত, প্রকৃতিগত বিভেদ খুবই অল্প। অসমীয়া সাহিত্যের এই যুগের বহু কবিতা, গান, ডাকের বচন সমসাময়িক বাংলার ঐরূপ কবিতা, গান ও ভণিতার সহিত অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত।

কাব্যসম্পদ ও মনের বৈচিত্র্যের চিত্র হিসাবে এই কবিতাগুলি অনবদ্য, যেমন

মোর মলুবাক কেনে মারিলে
অ মোর মলুবা রে
অ মোর মলুবা রে।
নেঠা নেঠা করে তাই নেঠা আনি দিলোঁ মই
নেঠাত ধরি ধরি কান্দে অ মোর মলুবা রে।

শতাব্দী পার হইয়া কালের সীমানা অতিক্রম করিয়া পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর পথ বাহিয়া বন্ধুর রথ আসিয়া জিজ্ঞাসা করিতেছে—অ মোর মলুয়া রে। গ্রাম্যকবির এই আক্ষেপ ও আকূতি আজও বাঙ্ময় হইয়া আমাদের হৃদয়কে বিচিত্রভাবে স্পর্শ

করে। কোথায় আমার মলুয়া, তোমার জন্য সব আনিয়া দিতেছি—

শাল শাল করে তাই শাল আনি দিলোঁ মই
শালত ধরি ধরি কান্দে অ মোর মলুবা রে।
সুতা সুতা করি কান্দে তাই সুতা আনি দিলোঁ মই
সুতাত ধরি ধরি কান্দে অ মোর মলুবা রে।

আবার কোনো বণিকপ্রিয়া লীলাবতী প্রিয়বিরহিত হইবার ভয়ে প্রিয়তমকে বাণিজ্যে যাইতে দিবেনা—

মাঝিক দিব টকাটকা গুবিয়াল ক দিব সোণা
আমার সাউদ বণিজে যায় সবে দিও মানা।

তার প্রিয়তম বাঁশীটি বাঁধা দিয়া যাইবে কিন্তু প্রতিটি সকালে ঘুম ভাঙিলে কার মুখ দেখিবে।

এই যুগের অসমীয়া সাহিত্যে 'বারমাহী' গীতের প্রভাবও প্রচুর। এই 'বারমাহী' গানে কয়েকটি জিনিস লক্ষ্য করিবার বিষয়—

১. কন্যার মুখ দিয়া সমাজজীবনের বারো মাসের একটি পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাইতেছে।

২. প্রিয় ব্যক্তি বাণিজ্য করে—বাণিজ্যবৃত্তি খুবই সাধারণ বৃত্তি। দেশে সুখ-সমৃদ্ধি পর্যাপ্ত ছিল—অন্নং বহু কুর্বীত।

৩. মাসগণনার আরম্ভ হইতেছে অগ্রহায়ণ হইতে। নতুন ধান্য উঠিয়াছে, ঘরে ঘরে নবান্ন—কৃষিসুলভ গ্রামীণ সভ্যতার বিকাশ।

মধুমতীর গীত ও কন্যা বারমাহী গীতে দেখি অগ্রহায়ণ—

অঘোনের মাহতে কন্যা সংসারে নবান্ ধান্
কতেক খাইতে মধু কতেক পুরাণ।
যার সংগে প্রিয়া আছে রান্ধি ভাত খায়
আমার সংগে প্রিয়া নাই (থাকিম) পরের মুখ চাই॥

অগ্রহায়ণে নবীন ধান্যের মধ্যে কতক খাইতে স্বাদু। কবি বলিতেছেন যেন মধু। সংগে সংগে মনে পড়িতেছে যার সংগে ঘরণী গৃহিণী আছে সে সদ্যতপ্ত উষ্ণ অন্ন পূর্ণানন্দে খায়, আর যার সংগে প্রিয়া নাই (যেমন তার প্রিয়র) সে পরের মুখে চাহিয়া থাকে। প্রিয়জন বিদেশে থাকিলে তার আহার রন্ধন কিরূপ হয় ইহার জন্য উৎকণ্ঠা যুগে যুগে নারীচিত্ত মথিত করিয়াছে। সেইজন্য মধুমতীর গানেও সেই আকুলতা—

খাবলৈ না পালা প্রভু নবান ধানের ভাত।

নতুন ধানের চালের ভাত তুমি খেতে পেলে না প্রভু, এদুঃখ নারী ও গৃহিণী হৃদয়ে বাজিবেই।

তারপর গানও শুনিতে পাইলে না—

হাতত ভম্বুরা লৈ নামিল সরস্বতী।

পৌষ মাসে দেখি—

পৌষর মাসতে কন্যা পুষ্পে অধিকারী
স্বামীত ভকতি করে ভাগ্যবতী নারী।

মাঘ মাসে কিন্তু মধুমতী ক্রন্দন জুড়িয়া দিল—

তুলি পারে গারু পারে সোণর সিংহাসন
তাতে বহি মধুমতী জুরিলা ক্রন্দন।

কন্যা-বারমাহীতেও ঐ কথা—ভিন্নদেশের সওদাগর আসিয়া দোহি দোহি লাগাইয়া দিল।—

ভিনি দেশের সাউদ আহি লাগাইলা মাত
চাউল দেও পাতিল দে'ও রান্ধি খোবা ভাত।
ভাল ভাল দাসী দে'ও চুরা ফেলাইবাক্
টৌ দে'ও জান্তি দে'ও বালুত মাজিয়া
ভোগ ধানর চাউল দে'ও দুধত পথালিয়া।
ভাত কঙগালী ন হওঁ কন্যা ভাত রান্ধি খাম
ধনর কঙগালী ন হওঁ কন্যা ধন লৈয়া যাম।

ফাল্গুন মাসে বসন্তাগমে যৌবনের ব্যথা দুর্দমনীয় হইয়া উঠিয়াছে—

মই নারী অভাগিনী থাকো পরর মুখ চাই
বনর বনুবা পখী সিও থাকে জোরে।..
বনর বনু পক্ষী সিও বান্ধে বাহা ঘর।

বনের যে বন্য পাখী সেও যুগলে থাকে, বাসা ঘর বান্ধে আর আমি অভাগিনী নারী—

জাঁই যুতি ফুটে ফুল তপত নয়ান,
জাঁই যুতি ফুলে ফুল খোপাতে ফুলাম।

চৈত্র মাসে কিন্তু অবস্থা আরও সঙগীন—

চৈতর মাসতে কন্যা চতুর দিশে মন,
বিলাওরে বিলাওরে কন্যা নবান্ যৌবন।
খাওরে কন্যা কর্পূর তাম্বুল বাঢ়োক পিরীতি
গুচাও মনের কৈটব মাঁগিছো সুরতি।

কিন্তু তাই বলিয়া কন্যা স্বেচ্ছাচারিণী নয়—

পরপুরুষক দেখোঁ বাপভাই সমান..
ধরমক চিন্তি তুমি যোবাঁ রাজপথে।

বৈশাখ মাস আসিয়াছে—'দীর্ঘদঘ্দিন রজনী নিদ্রাবিহীন'। ডাহুকী ডাকিতেছে, বুকের ছাতি ফাটিয়া যাইতেছে, মধুমতী বলিতেছে—

বৈহাগর মাহত ডাউকী কান্দয়
ডাউকীর কান্দন শুনি হৃদয় ন সহয়

বাংলা মৌথল বৈষ্ণব সাহিত্যের এই ডাহুকীর প্রভাব অসমীয়া সাহিত্যেও দেখিতে পাই।

বৈশাখ মাসে অতিথি সৎকারের জন্য 'ডাক ডালিম শ্রীফল' শুধু নয়—

চন্দনে চিটিকা দিয়া ভৃঙ্গারর পাণী
ভৃঙ্গারর পাণী নহে উত্তম গঙ্গাজল।
বাড়ি ভরি আছে আমার ডাব নারিকল
গোহাল ভরি আছে আমার সাতপাঞ্চ গাই॥
দৈ দধি ঘৃত মধু..

প্রাচুর্য ও স্বাচ্ছল্যের ছবি।

জ্যৈষ্ঠ মাসে কিন্তু কন্যা আবার চঞ্চলা হইয়া ওঠে। নিদাঘতপ্ত দিনে বিরহ দারুণ, সে সওদাগরকে জিজ্ঞাসা করে—

কোন দেশে থাকা সাউদ, কোন দেশে ঘর
কিনাম তোমার মার কিনাম বাপর।

মধুমতী তাই খেদের সঙ্গে বলিতেছে—

যাকে বোলো আপোন আপোন সেযে হয় পর।

আষাঢ় মাসে বর্ষাগমে মধুমতীকে দেখি অন্যথাবৃত্তিচেতঃ, বিরহীযক্ষের মত সে বলিতেছে—হে স্বামী, হে প্রিয়তম, তুমি এসো—

আমার জনমের দুঃখ ঘুচুক্ তোমার চাঁদমুখ দেখি।

'কন্যাবারমাহী'তে কন্যাকে যখন বলা হইল

তোমার স্বামী কাটা গৈছে কাঞ্চনপুরর ভাথি।

তৎক্ষণাৎ সে চীৎকার করিয়া বলিল

না যাইছে না যাইছে কাটা আমার টিকর পতি।

শ্রাবণের বর্ষণমুখর তিমিরনিবিড় সন্ধ্যায় তার বিরহবেদনা আরো জাগিয়া ওঠে

শাওনর মাহত বোরনর দিন
খাব না পালে পুরুষর রস হয় হীন

তখন মনে হয় গলায় কাটারি দিয়া প্রাণত্যাগ করি

গলত কটাবি দি তেজিম পরাণে

পরিস্থিতি এমনই জটিল যে মুখরিত শ্রাবণের রাত্রিতে পুরুষ আসিয়া প্রেম নিবেদন করে—

শাওণর মাসতে কন্যা শাওনীয়া রাতি
আজি রাতি কন্যা মই ভুঞ্জিবো সুরতি

কিন্তু কন্যাও চতুরা, সেও চোর ধরিবার আয়োজন করিয়াছে—

আজি রাতি চোর মই থাকে লাগল পাওঁ
হাতে গলে বান্ধে তাকে রাজঘরে পঠাওঁ
চারি কালে রাখি থম প্রহর চারিটি
দুয়ার মুখত বান্ধি থম মত্ত গজহাতি
শিথানে পৈথানে লগাম ঘৃতর পাণ্ড বাতি
তীক্ষ্ম খান্ডা হাতে ধরি জাগিম চৌপর রাতি।

ভাদ্র মাসে

হাসি খেলি বিদায় দিয়া যাঁও নিজদেশ
তুমি হলা ভিন পুরুষ আমি ভিন নারী
বাপর শকতি নাই বিদায় দিতে পারি।

কিন্তু ধর্মজ্ঞান, নীতিজ্ঞান শেষ পর্যন্ত প্রবল

ধরমক্ চিন্তি তুমি যোবা রাজপথে

কবি কিন্তু শেষপর্যন্ত সমস্যা অন্যরকমে মিটাইয়া ফেলিলেন। তার মস্তিষ্ক ও হৃদয় অন্তর্দ্বন্দ্বের শেষ হইল—এই পরপুরুষ, পরপুরুষ নয়, শিশুকালে বিবাহিত তাহারই পতি

আহিনর মাহতে কন্যা নিরমল রাতি
পরপুরুষ নোহোঁ কন্যা তোর টিকর পতি।

কে সে

শিশুকালত বিয়া করাইছো মাণিক সদাগর
নানা আড়ম্বরে আসিছিলো তোমার ঘর

তখন প্রদীপ হাতে কন্যা নদীর ঘাটে চলিল, বারো মাস শেষ হইয়া গিয়াছে, মিলনের শেষ পর্ব।

এই যুগের গাবলীয়া গীতের নমুনা এইরূপ—ফুলকোঁওর গীত—

মনেকৈ উজালে চিতেকৈ ভটিয়াই
দুখরে বাতরি কথা
কিনো কৈয়ে থাম কিনো শুনি যাবি
মনতে লাগিবে বেথা

কিন্তু এই যে ফুলকুমার যার দুঃখের কথা বলা হইতেছে যাহাতে মনে ব্যথা লাগে, তিনি পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া চলিলেন

কাঠর পখী ঘোঁড়া পাই ফুল কোঙর
বিজুলী সঞ্চারে চলে

পক্ষীরাজের কৃপায় এক মালিনীর মালঞ্চে ফুলকুমার উদয় হইলেন, সেখানে সেঁউতি, মালতী, টগর গুটিমালী কোনো ফুলের অপ্রতুল নাই—

ফুলকে গুঁথিলে ফুলতে লিখিলে
ফুলতে বাতরি দিলে।

শেষকালে

পাঁচতুলীর নগর সোমাল ফুলে কোঙর
কালিন্দী ভোমরা হৈ

মণিকোঙর গীতও রূপকথারই সন্ধান দেয়—

শঙ্কল দেব রজারে পুতেক মণি কোঙর
কিছুত খতি খনে নাই।

শঙ্কর দেব রাজার পুত্র মণিকুমার। মন্ত্রীর কন্যা কাঞ্চনকুমারী তার মন হরণ করিয়াছেন এই মূল তথ্য লইয়া রূপকাব্যটি রচিত। এই প্রসঙ্গে একটি কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। শুদ্ধ ঐতিহাসিকতার দিক হইতে ভাষাগত ও অন্য প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া নিসংশয়িত চিত্তে বলা যায় না যে এইসব গীতিকবিতার সবগুলিই প্রাক্‌বৈষ্ণব যুগের। অনেক সময় মনে হয়, এই পুরাতন গাথাগুলির উপর সমসাময়িক ভাব ও ভাষার যথেষ্ট প্রলেপ পড়িয়াছে। সেইজন্য তাহাদের বর্তমান রূপ কোন শতাব্দীর সে কথা ঐতিহাসিকরা গবেষণা করুন, কিন্তু সাহিত্যিক রসবিচারে তাহাদের মূল রূপ যে প্রাক্‌বৈষ্ণবীয় যুগের সহিত সংশ্লিষ্ট এইটুকুই যথেষ্ট এবং সেইজন্যই ইহাদিগকে অসমীয়া সাহিত্যের আদিমযুগের অধ্যায়েই বিচার করা হইয়াছে। আর একটি কথা, যে কথাটি আমি পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়াছি যে, প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্য ও বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ, ধীর ভাবে বৈজ্ঞানিক মনোভাব, উদার স্বাদেশিকতা ও ঐতিহাসিক বিবর্তনের দৃষ্টিতে আলোচনা করিলে দেখা যাইবে যে বহুস্থলে উদ্ধৃত ভাব ও ভাষা সমানভাবেই বাংলা ও অসমীয়া দাবী করিতে পারে। ইহাতে দুইপক্ষেরই অগৌরবের কিছু নাই এবং তার কারণ ঐতিহাসিক। প্রাচীন কামরূপীয় সংস্কৃতির বিকাশ মিথিলা হইতে ব্রহ্মপুত্রের তীর অবধি। এই প্রসঙ্গে অসমীয়া সাহিত্যের খ্যাতনামা লেখক শ্রীযুক্ত ডিম্বেশ্বর নিওগের মত প্রণিধানযোগ্য—

"পূব ভারতত অসমীয়া আরু বাঙলা ভাষায়ো এই যুগের শেষ ভাগতহে নিজর সুকীয়া গঢ় লবলৈ ধরে। সেই কারণে আলপলৈকে বাঙলা সাহিত্যের ভিতরুবা বুলি ধরা বৌদ্ধগান আরু দোহার দরে, শূন্যপুরাণ, কৃষ্ণকীর্তন আরু গোপীচন্দ্রর গানকো আমি অসমীয়া সাহিত্যর অন্তর্গত বুলি ধরিছো; কিয়নো সেই বোরত বঙলা ভাষার বৈশিষ্ট্য তেতিয়া ফুটিয়া উঠা নাই, কিন্তু পূব-ভারতীয় বা বৃহত্তর কামরূপীয় ভাষার প্রাধান্য ভালদরে রক্ষিত হৈচে। সরহ নালাগে কবীন্দ্র সঞ্জয় আরু অনন্ত কন্দলীর দরে ষোড়শ শতিকার অসমীয়া কবি-সকলক বঙালীয়ে বঙলা বোলা কথাই ইয়াকোহ প্রমাণ করে যে অসম বঙ্গ আদি বর্তমান ভৌগলিক প্রদেশ বোধ জন্ম হোবার আগলৈকে অন্ততঃ অসম, বঙ্গ আদি সদৌ পূব ভারতব ভাষা-মূলক আরু সাংস্কৃতিক ঐক্য অটুট ছিল।"

এই বক্তব্যের প্রধান যুক্তি হইতেছে যে বৌদ্ধগান ও দোহা, শূন্যপুরাণ, কৃষ্ণকীর্তন, গোপীচন্দ্রের গান অসমীয়া সাহিত্যের অন্তর্গত বলিয়া ধরা হইয়াছে, কেননা তাহাদের ভিতর তখনও বাংলা ভাষার বৈশিষ্ট্য তেমন ফুটিয়া উঠে নাই। বরং তাহাদের মধ্যে পূর্ব-ভারতীয় বা বৃহত্তর কামরূপ ভাষার প্রাধান্য ভাল ভাবে রক্ষিত হইয়াছে। আর একটি কথা, আসাম বাংলা প্রভৃতি বর্তমান ভৌগোলিক

প্রদেশবোধ জন্ম হইবার পূর্বেই এইসব অঞ্চলে এক সাংস্কৃতিক চেতনা ও ঐক্য অটুট ছিল।

সমস্ত কামরূপে বিশেষ করিয়া ব্রহ্মপুত্রের উত্তরপারে (যেমন ফুলবাড়ী) বহু অঞ্চল জুড়িয়া আই পূজার বহু বিবরণ পাওয়া যায়। সাহিত্যেও ইহার অবদান আছে। কছাড়ীর বুঢ়াড় বুঢ়ী (হরপার্বতী) পূজা, কেচাইখাতির তাম্রেশ্বরী পূজা, দেবী কামাখ্যার রূপান্তর, জল্পেশ্বরের উপাখ্যান, বশিষ্ঠের কাহিনী, বার-ভূঞার আই পূজা, তান্ত্রিক শক্তি উপাসনারই এক রূপ। ইহার সঙ্গে বেমালুম মিশিয়া গিয়াছে বৈদিক রুদ্র, অস্ট্রিক ভূমাতা, ও কিরাতদের শিব, এমন কি নাগাদের নরখাদিনী দেবী। আই পূজার ইতিহাস অনুধাবন করিতে হইলে একটি কথা মনে রাখা চাই যে, সারা কামরূপে অষ্টম নবম শতাব্দী হইতে চতুর্দশ শতাব্দী পর্যন্ত তন্ত্রের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল ছিল এবং তাহার পরও আজ পর্যন্ত তাহার একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। কামরূপের সীমানা ছিল—

ত্রিংশদ্ যোজন বিস্তীর্ণং দীর্ঘেন শত যোজনং
কামরূপং বিজানাহি ত্রিকোণাকারমুত্তমম্
নেপালস্য কাঞ্চনাদ্রি ব্রহ্মপুত্রস্য সঙ্গমম্
করতোয়াং সমাশ্রিত্য যাবদ্দিক্করবাসিনী

আবার বলা হইতেছে—

উত্তরস্যাং কঞ্জগিরি করতোয়াতু পশ্চিমে
তীর্থশ্রেষ্ঠা দিক্ষুনদী . .

কালিকাপুরাণ ও যোগিনীতন্ত্রে শৈবশাক্ত আসামের একটি সম্পূর্ণ চিত্র পাওয়া যায়। দ্বাদশ শতাব্দীর ধর্মপালের তাম্রশাসনে শিব আর পার্বতীর বন্দনা আছে। নবরত্নেশ্বর তন্ত্রে বলা হইয়াছে 'বৌদ্ধং ব্রাহ্মং তথা সৌরং শৈবং বৈষ্ণবং চ শাক্তং' সকলেই তন্ত্রোপাসক হইতে পারিত। বৌদ্ধতান্ত্রিক বজ্রযোগিনী সাধনায় অর্ঘ্যদানের পদ্ধতিতে ওড্ডিয়ান, পূর্ণগিরি, সিরিহট্টের সঙ্গে কামাখ্যার উল্লেখ প্রণিধানযোগ্য। তন্ত্রসারেও বলা হইতেছে, মূলাধারে কামরূপ। সাধনমালা গাইকোয়াড় সিরিজ দ্বিতীয় ভাগে সাধন সংখ্যা 'ওঁ কামরূপ বজ্রপুষ্পে স্বাহা' এই মন্ত্রের সঙ্গে 'ওঁ নমঃ সর্বগুরু বুদ্ধবোধিসত্ত্ব বজ্রপুষ্পে স্বাহা' উল্লেখও আছে।

'আইরনাম' কবিতাগুলি পড়িলে মনে হয় দেবী এখানে একেবারে গাঁয়ের মানুষ হইয়া সকলের একান্ত আপন হইয়া গিয়াছেন।

আই ভগবতী আই, তোমার মান সুন্দরী নাই
অম্বিকা চণ্ডীকা ভবানী কালিকা এইরূপে ফুরা বেড়াই।

লক্ষ্য করিবার বিষয় যে 'আইদেবী' অম্বিকা চণ্ডিকা ভবানী কালিকারই অন্যরূপ। প্রাচীন অনার্যদেবতা তাম্রেশ্বরী, বেদোক্ত অম্বিকা, পুরাণোক্ত ভবানী, চণ্ডিকা, কালিকা সকলেই আইদেবীর মধ্যে লুপ্ত হইয়া গিয়াছেন, এমন কি লক্ষ্মী সরস্বতীও।

দিনের শেষ, সূর্য পাটে বসিয়াছেন, ঈষৎরক্ত আকাশের নীলিমায় আসন্ন সন্ধ্যার আনত ছায়া, মহামায়া নামিতেছেন। তাঁর হাতে সোনার বাঁশী, আর কমলের ফুল।

দুখীয়ালৈ পেলাই দিছে সুখিল ফুলের মালা

গজেন্দ্রগামিনী দুর্গতিনাশিনী আইদেবী কৈলাস হইতে এমনি এক মায়ামন্থর সান্ধ্যক্ষণে ভক্তের পূজা গ্রহণ করিতে নামিলেন ঘাটের পরে।—

পিচলারে ঘাটে আইয়ে স্নান করে
লাহর কেশ টারি মেলি

কেশবতী কন্যা তিনি—দীঘল চুল। 'আই' হচ্ছেন গরীবের দেবতা 'দুখীয়ার পুতলা'। তাঁর নাম 'শীতলা' 'দি যোঁরা বুক জুরাই'—তাঁহাকে পাইলে বুক জুড়াইয়া যায়, প্রাণটা শীতল হয়।

ভক্ত গোসানী জিজ্ঞাসা করিতেছে—কি দিয়া তোমায় পূজা করিব, ফল, দুধ, ধন, জল, অন্ন, বস্ত্র, মন, চিত্ত—

যেই বস্তু দিওঁ মাতৃ সেই বস্তু চুবা
আপোনার নামে মাতৃ সন্তুষ্ট হোবা।

নবম ও দশম শতাব্দী হইতে শ্রীহট্ট কামরূপ ও আসামের অন্যত্র বৌদ্ধ তান্ত্রিকতার প্রসারের যুগ বলিয়া ঐতিহাসিকেরা মনে করেন। লামা তারানাথের উক্তি এই যুক্তি সমর্থন করে। এই যুগের সংস্কৃত সাহিত্যের একটি উল্লেখ পাওয়া যায়। ঐতিহাসিক মতে জয়ন্তীয়া রাজা কামদেব, ভোজবর্মা নামে পূর্ববঙ্গের এক রাজার নিকট হইতে কবিরাজ পণ্ডিত নামে এক সংস্কৃতজ্ঞ কবিকে (একাদশ শতাব্দীতে) লইয়া আসেন। তিনি বিজয় রাঘবীয় নামে এক মহাকাব্যের রচয়িতা।

মধ্যযুগীয় আসামে বহু তন্ত্রমন্ত্রের প্রচার ছিল এবং এইসব তন্ত্রমন্ত্র, তাহাদের ব্যাখ্যা, প্রকরণ নানা পুঁথিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। ফলে এক বিরাট মন্ত্রসাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। তখনকার দিনের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসে লোকমত, ক্রিয়াকলাপ ও বিশ্বাসের মানদণ্ড হিসাবে এই মন্ত্রগুলির বিশেষ মূল্য আছে। সাহিত্যের দরবারে দেওয়ান-ই-খাসে স্থান না পাইলেও দেওয়ান-ই-আমে ইহার স্থান আছে। ঠিক কোন শতাব্দীতে এই মন্ত্রসাহিত্যের উৎপত্তি তাহার সঠিক নির্ণয় অসম্ভব। তবে ভাষাগত বিচার, ইতিহাসের ধারা, বৌদ্ধতান্ত্রিকতার অপভ্রংশ-যুগের কাহিনীর মূল্য সব দিয়া বিশ্লেষণ করিলে মনে হয়, বাংলার কিছু অংশ ও কামরূপ জুড়িয়া এইসব মন্ত্রের ও ডাকের বচনের উৎপত্তি অষ্টম নবম শতাব্দী হইতে। তাহার পর শতাব্দীর পর শতাব্দী বাহিয়া এইসমস্ত প্রাচীন বচন ও মন্ত্র জনসাধারণের স্মৃতিতে ও শ্রুতিতে অক্ষয় হইয়া আছে, কখনও কখনও লিপিবদ্ধ হইয়া পুঁথিতে আশ্রয় লইয়াছে। অথর্ব বেদই এইসব মন্ত্রপুঁথির আদি, ইহার স্পষ্ট উল্লেখ অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। ব্রহ্মকরতী পুঁথিতে পড়ি—

"অনন্ত শয্যাত গোঁসাই শুতি আছিলন্তে। রাজ ভৈলা চার বেদ নিঃশ্বাস কাঢ়ন্তে। অথর্ব বেদর অরণ্য করতী কহে। করতী মন্ত্র জগততে রহে।"

অন্য করতী মন্ত্রেও এইরূপ সমর্থন আছে—"ওঙ্কার শবদে অথর্ব বেদ ভৈলা। অথর্ব বেদ আছে করতি কহে। করতির হস্তে জগত বহে। ওঙ্কার শবদে গোসাই জপিবার টললা। ওঙ্কার শবদে চারি বেদ বান্ধ।"

আঙ্গিরসী অথর্ববেদ জনসাধারণের বেদ। আথর্বন, শক্তির, পূর্ণতার, ভোগের স্বপ্ন দেখেন। তাই এত ক্রিয়াকান্ড, এত মন্ত্রতন্ত্র।

অসমীয়া মন্ত্রসাহিত্য গদ্য ও পদ্য দুই মিশাইয়া। গদ্যের মধ্যে করতী পুঁথি, বীরাজরা পুঁথি, সাপর ধারণী পুঁথি ইত্যাদি। শ্রীযুক্ত বিরিঞ্চিকুমার বড়ুয়া অসমীয়া মন্ত্রগুলিকে পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়াছেন: (১) মহাপ্রতিসরা—পাপ রোগ ব্যাধি দূরের জন্য (২) মহাসহস্র প্রমর্দিনী—ভূতপ্রেত পিশাচ তাড়াইবার মন্ত্র (৩) মহামায়ূরী—সর্ববিষ নিবারণের মন্ত্র (৪) মহাশীতবতী—গ্রহদোষ ও জীব-জন্তুর ভয় দূরের জন্য এবং (৫) মহামন্ত্রানুসারী—অন্যান্য নানা কর্মের জন্য।

ইহা ছাড়াও জন্ম মৃত্যু বিবাহ প্রেম বিষয়ক নানা মন্ত্র আছে। এইসব মন্ত্রগুলির মধ্যে সাহিত্যের বীজ লুক্কায়িত। মন্ত্রগুলির পরিচয়েই তাহাদের বিষয়বস্তু পরিস্ফুট হইয়াছে। যেমন বৃক্ষআরোপণ, গৃহকম্পন, তাম্বুলঝরা, পুষ্পঝারা, কদলীপত্রঝরা, সরিষাঝরা, দিশবন্দি ধনুবাটলি, বিড়াবন্ধ ইত্যাদি। পুষ্পঝাড়া মন্ত্রটি এইরূপ—

ডাহিন হাতে মালতী বাম হাতে পুষ্প চয়
আচোক মনুষ্য দেবতা কাম্পয়
কম্পো অস্তগিরি করে টলবল
পাতালর পরা আসি নিকালিল জল
লং ইতি পুষ্প ঝারণং—

সুদর্শনচক্র করতীতে সুরসভার সুন্দর সাহিত্যিক বর্ণনা আছে। সুদর্শনের রোষে—

প্রিথিবি লরিলা মেরুগিরি টলিলেক
সাগর টলিলা মন্দার লরিলা
কম্পিলা স্বর্গ মন্ডল।

মন্ত্রের নাগপাশ জড়াইয়া ধরে সাতপাকে। মুক্ত হয় আবার সেই মন্ত্রের জোরেই। 'মহাভীম পাতালী রাগিনী জেগে ওঠে মায়াকালী নাগিনী'। সাগর দোলে, পৃথিবী নড়ে, মেরু গিরি টলে, মানুষ দেবতা সবাই কাঁপে।

ডাক-ভণিতার মধ্যে আমরা জন্মপ্রকরণ, ধর্মপ্রকরণ, নীতিপ্রকরণ, রাজনীতি-প্রকরণ, বন্ধনপ্রকরণ, জ্যোতিষপ্রকরণ, গৃহিণীলক্ষণ, কৃষিলক্ষণ প্রভৃতি সমাজের নানাদিকের পরিচয় পাই।

ধর্মপ্রকরণে দেখি—

ব্রাহ্মণের পিতৃদেব অর্চন
ক্ষেত্রিয় সবর পূজাপালন।
বৈশ্যর বাণিজ্য ধন আর্জন
শূদ্রর স্বধর্ম নীতি সেবন॥

কি কি কর্তব্য—

তেরেসে ধর্মক করিব জানি
পুখুরী খানিয়া রাখিব পাণি।
বৃক্ষরোপণত অধিক ধর্ম
মঠমণ্ডপ গুরুকর কর্ম॥

পুষ্করিণী খনন, বৃক্ষরোপন, মঠমণ্ডপের চেয়ে গুরুকার্য আর নাই—

অন্নজল জানা অধিক দান
তাত কবি নাহি শ্রেষ্ঠ যে আন
ভাল দ্রব্যকে যেখেনে পাইব
দেবতা দ্বিজক তেখেনে দিব..
ঔষধ দানত নাহিক তুল।

সুগৃহিণীর লক্ষণ কি—

পতিপদ বিনে আনত নাই মতি—
গৃহে বাতি দেই সন্ধ্যাবেলাত—
রন্ধন করয় বচন মিঠ
সেই গৃহিণীক বোলয় ইষ্ট।

আর কি—

শাশুরীত পুছি করে আয়ব্যয়
সে নারীক সদা লক্ষ্মী নেরয়।

এবং সেই নারী সঞ্চয়ী—

রৌদ্রত কাটিকুটি যবে শুকাই
বর্ষা চারি মাসে বসিয়া খাই।

এবং—

যি নারী প্রভাতে নিদ্রাক যায়
বাসি শয্যাত সূর্যক পাই।
উদয় কালত নিলিপে ঘর
ডাক বলে তাইক ছারিয়ো নর॥

আবার যে মেয়ে—

অল্প খায় ফেলে প্রচুর
ডাক বোলে তাইক করিও দূর।

সরু সুতা কাটা ও তাঁত চালানোও সুগৃহিণীর এক বড় লক্ষণ, আজও যাঃ আসামে দেখা যায়।

তৎকালীন গ্রামীণ সভ্যতার বড় পরিচয় পাওয়া যায় ডাকভণিতার কৃষিলক্ষণ বৃষ-লক্ষণ প্রভৃতি বচনগুলিতে—

গরু কিনিবা চিকণ জালি
দুই চারি ছয় দন্তীয়া ভালি
হরিণর সমান জিহ্বা কাণ
হেন বলদ বিচারি আন।

জ্যোতিষপ্রকরণে দেখি—

দধি মধু ঘৃত শুক্ল তণ্ডুল
শুকুলা চামর শুকুলা ফুল।
হংসদৈবজ্ঞ সুন্দরী কন্যা
যাত্রার কালত সকলো ধন্যা।

এইসব ডাক ভণিতায় সমাজবিন্যাসের নানা স্তরের কথাও পাওয়া যায়—

কামারর চিকন অস্ত্র
ধোবার চিকন বস্ত্র

আবার ব্যঞ্জনের চিকন কি না হালধি অর্থাৎ হলুদ।

আজও চিকিৎসাশাস্ত্র ও ঔষধ সম্বন্ধীয় নানা পুঁথি আসামের বহুস্থানে ছড়াইয়া আছে। শ্রীযুক্ত কালীরাম মেধী একটি ওঝা চিকিৎসকের কাছে ঐরূপ ১১০ খানি প্রাচীন পুঁথির সন্ধান পাইয়াছিলেন। ছায়াজ্বরবাণ হইতে আরম্ভ করিয়া বায়ুরোগনিবারণী বায়ুর মন্ত্র পর্যন্ত ঐসব চিকিৎসাশাস্ত্রসাহিত্যে পাওয়া যাইত।

পূর্বেই বলিয়াছি, ভাব ভাষা বিষয়বস্তুর বিচার করিয়া দেখিলে এইসব পদগুলির কিছু কিছু বৈষ্ণব বা বৈষ্ণবোত্তর যুগের হইলেও ইহারা যে প্রাচীন কিম্বদন্তী ও প্রাক্‌বৈষ্ণবযুগের মৌখিক লৌকিক সাহিত্যের লিখিত পরিণত রূপ, সে বিষয়ে সন্দেহের বিশেষ কারণ নাই। অবশ্য অনেক ভণিতাতে আরবী ও পারসিক শব্দেব প্রচলন দেখিতে পাওয়া যায়। অসমীয়া কিম্বদন্তী অনুসারে ডাক বরাহমিহিরের পুত্র। মিহিরমুনি কামরূপ পরিভ্রমণে আসিয়া যে বাড়ীতে আতিথ্য গ্রহণ করেন সেই বাড়ীর কনিষ্ঠা বধূর পুত্র হয় নাই। মিহির মুনির পরিচর্যা করিয়া ও আশীর্বাদের ফলে সে পুত্রবতী হয়, এবং সেই পুত্রই ডাক।

শ্রীযুক্ত কালীরাম মেধী অসমীয়া ভাষার কয়েকটি আদিরূপ কামরূপশাসনাবলী হইতে সংগ্রহ করিয়া তাঁহার 'অসমীয়া ব্যাকরণ আরু ভাষাতত্ত্ব' নামক পুস্তকে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যেমন 'আম্ভ' অর্থাৎ 'আম' (দশম শতাব্দীর বলবর্মা নওগাং তাম্রশাসন ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর রত্নপালের সুয়ালকুচি পট্টোলি) বা কোপ্পা অর্থাৎ কূপ বা কুয়া (বলবর্মার তাম্রশাসন) বা বেঙ্কা অর্থাৎ বাঁকা বা বক্র (ধর্মপালের পুষ্পভদ্র পট্টোলি)। এই পট্টোলিতে হাড়ি, সুবর্ণদারু প্রভৃতি আরও বহু কথা পাওয়া যায়।

অসমীয়া সাহিত্যের উৎপত্তি ও প্রসারের মূলে রাজনৈতিক সাহায্য ও ধর্ম-প্রভাব প্রবল ছিল। পৃথিবীর সর্বত্রই দেখা যায় রাজা, ভূস্বামী ও রাজপুরুষেরাই সাহিত্যিকদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন।

৩. প্রাক্‌বৈষ্ণবী 'কন্দলী' যুগ

প্রাগ্‌জ্যোতিষপুরের পালবর্মারাজাদের পতনের পর কামরূপের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। গৌড়াধিপতি রামপালের সময় বাঙালী সৈন্য কামরূপ আক্রমণ করে এবং বৌদ্ধতান্ত্রিক নানা আচারবিচার কামরূপে সুপ্রতিষ্ঠিত করে। আজ পর্যন্ত বিজেতাদের দ্বারা স্থাপিত ময়নাগড় জাদুবিদ্যার প্রধান স্থান। কুমারপালের মন্ত্রী বৈদ্যদেব পুনরায় কামরূপবিজয় করেন, এবং তিঙগদেবকে পরাজিত করিয়া নিজ রাজত্ব স্থাপন করেন। এই রাজাই কামতারাজের স্থাপয়িতা বলিয়া মনে হয়। ব্রহ্মপুত্রের অপর পারে দিনাজপুর হইতে দরং পর্যন্ত এই কামতা ভূখণ্ড বিস্তৃত ছিল। তেজপুরে ও গোয়ালপাড়ায় প্রাপ্ত বহু তাম্রশাসন, প্রস্তর মূর্তি (যেমন ব্রহ্মা, শিব, গণেশ) ও প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ ফলক হইতে জানা যায় তদানীন্তন সেনসম্রাটদের বাংলাদেশের সঙ্গে কামতাধিপতিদের বিশেষ সংযোগ ছিল। এই সময়েই বখ্‌তীয়ার খিলিজী কামরূপ অভিযানে আসেন এবং পরাজিত হন। কানাইবরশী শিলালিপিতে আছে 'শাকে তুরগে যুগ্মেশে মধুমাস ত্রয়োদশে কামরূপং সমাগত্য তুরস্কাঃ ক্ষয়মাযযুঃ।'

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষভাগে কামতাপুরাধিপতি দুর্লভ নারায়ণের নাম সাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকরূপে জ্বলজ্বল করে। তাঁহাকে ঠিক অসমীয়া রাজা বলা যায় কি না, এ বিচার ঐতিহাসিকের, সাহিত্যিকের নয়। তাঁহার রাজসভায় হেমসরস্বতী ও হরিহরবিপ্র নামে দুইজন কবি ছিলেন। হেম সরস্বতীর প্রহ্লাদচরিত্র বিখ্যাত।

পরবর্তীকালের দৈত্যারি ঠাকুরের গুরুচরিতে ও দ্বিজভূষণের লেখায় রাজা দুর্লভনারায়ণের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁহার পুত্র ইন্দ্রনারায়ণের রাজত্বকালে কবিরত্ন-সরস্বতী মহাভারতের দ্রোণপর্ব অনুবাদ করেন। মহামাণিক্য বারাহীরাজের পৃষ্ঠ-পোষকতায় মাধব কন্দলী রামায়ণ অনুবাদ করেন। "মহামাণিক্য" উপাধি থাকায় অনেকে মনে করেন এই বারাহী রাজারা ত্রিপুরাধিপতি ছিলেন। পরবর্তীকালে বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর নামে দুই অসমীয়া কবি ত্রিপুরারাজের সভাকবি ছিলেন। ইহা রাজমালা হইতে জানা যায়।

এই সময়ের পদ্মপুরাণ নামে একটি আখ্যায়িকায় হাসেনহুসেনের সহিত দেবী পদ্মাবতীর ভক্তদের ঘোর যুদ্ধের বিবরণ লিখিত আছে। হাসেনহুসেন বাংলার রাজা হুসেন শাহ হওয়াই সম্ভব। রাজা দুর্লভনারায়ণ ও তাঁহার তনয় ইন্দ্র-নারায়ণদেব চিরঞ্জীব 'পাণ্ডগৌড়েশ্বর' বলিয়া খ্যাত ছিলেন।

অসমীয়া সাহিত্যের কবি হিসাবে হেম সরস্বতীর নামই সর্বপ্রথমে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রহ্লাদচরিত্র আরম্ভ করিলেন নারায়ণকে নমস্কার করিয়া—

জয় নমো নারায়ণ বৈকুণ্ঠর পোতি।
তোমার চরণে লৈলৈ সরণ সম্প্রতি॥

প্রহ্লাদের উপর হিরণ্যকশিপু নানা অত্যাচার আরম্ভ করেন। ভগবানের বরে ভক্তের কিছুই হয় না। অযুতহস্তী, উদ্যতফণা সর্প, তপ্ততৈল, প্রজ্বলিত অগ্নি, সমুদ্রের তুফান কিছুই প্রহ্লাদকে 'জমকরণে পঠাইবু' না পারে, 'অচেদ অভেদ দেহা অজর অমর'।

হরির প্রভাবে ন জলয় বৈশ্বানল
প্রহ্লাদের গাবে জেন চন্দন সিতল।

ভক্ত প্রহ্লাদ নারায়ণের স্তব করিতেছেন—

চরণোত পরিয়া প্রহ্লাদ করে স্তুতি।
জন্মে জন্মে হোক মোর তোমাত ভকতি॥
নমো নারায়ণ প্রভু জগতকারণ।
নাহি আদি অন্ত প্রভু তুমি নিরঞ্জন॥
অনাদি পুরুষ তুমি নাহি অন্ত ভেদ।
তুমি চৈধ সাস্ত্র প্রভু তুমি চারি বেদ॥

কিন্তু এই কাহিনীতে কবি হিরণ্যকশিপুর চরিত্রে পরিবর্তন ঘটাইয়া তাঁহাকে নারায়ণের ভক্তরূপেই দেখাইয়াছেন—

দেখিআ হিরণ্য অতি ভৈলা ভয়ে ভিত।
কাম্পিলা হৃদয় অতি দেহা জর্জরিত॥
আথে বেথে সাবতিয়া বুলে ধন্যপুত্র।
এহিখানি কথা বাপু সিখিলিহ কৈত॥
নমো নারায়ণ প্রভু দেব যদুপতি।
তোমার চরণে মোর থাকোক ভকতি॥

কবি অতি চমৎকার ভাষায় নৃসিংহরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

অৰ্ধ কলেবর সিংহোর সদৃখ
অৰ্ধেক মনিস্য কাই
হাতর নখ জে তৃসুল সদৃখ
বুলন্ত হিয়া বিদারু
দিনোত রাতৃত একোতে নমরে
সন্ধ্যা সময়ত মারু॥
অতি ভয়ংকর রূপ ধরিলান্ত
দেখন্তে লাগে তরাস
সোরির যৈবার ন পরান্ত ঠাই
জুরিলা দিস আকাস।

হিরণ্যকশিপু ও নৃসিংহের যুদ্ধের বর্ণনা প্রায় সিংহব্যাঘ্রের সহিত মল্লযুদ্ধেরই সমতুল্য—কবি তাহা সেই পর্যায়েই নামাইয়া আনিয়াছেন—

এক লাম্ফ দিয়া হরি হিরণ্যকে ধরি
মালবান্ধে ধরি পেলাইলন্ত চিত করি।

পিতার মৃত্যুতে প্রহ্লাদকে কবি শোকার্ত করিয়াই দেখাইয়া কাব্যের মানবীয় সুর বজায় রাখিয়াছেন, সেইটাই তাঁহার কৃতিত্ব —

পিতৃর মরণ পাচে প্রহ্লাদ দেখিলা
হৃদয়ত তান মহা সন্তাপ লাগিলা
হা প্রাণ পিতা মঞি কি কাম করিলো

ভক্তের ভগবান তাহাকে অবশ্য আশ্বাস দিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করিবার বিষয় যে তিনি 'দুষ্টের দমন শিষ্টের পালন' এসব কথা না বলিয়া একেবারে বেদান্তের চরমে উঠিয়া বলিলেন 'কে কার স্ত্রী, কে কার পুত্র, কে কার পিতা মাতা', যেন গীতায় শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে উপদেশ দিতেছেন—

না কান্দা না কান্দা বাপু ন কর সন্তাপ
কৈব ভার্যাপুত্র দেখা কৈর মার বাপ।

অসমীয়া জনমনে রামায়ণের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। রাম ও সীতার চিরন্তনী বিরহমিলন-কাহিনী, লোকচিত্তকে সহজেই আকৃষ্ট করিত। শ্রীযুক্ত বাণীকণ্ঠ কাকতির মতে দেওপর্বতে দশম একাদশ শতাব্দীর ভগ্ন মন্দিরের স্তূপে রাম লক্ষ্মণের ও হনুমান সুগ্রীব প্রভৃতি ভক্তদের মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। অসম প্রাদেশিক মিউজিয়ামে একটি রামমূর্তিও পাওয়া গিয়াছে। একাদশ শতাব্দীর রাজা ইন্দ্রপালের তাম্রশাসনেও রামচন্দ্রের উল্লেখ আছে। বাংলাদেশে পালসাম্রাজ্যের শেষ সূর্য সম্রাট রামপালদেবের জীবনী অবলম্বনে সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের জীবনীর দ্ব্যর্থবোধক ভঙ্গীতে লিখিত। কিন্তু কাকতি মহাশয় যে 'রাম নৌ হত্তেই রামায়ণ', 'রামে মারিলেও মরা, রাবণে মারিলেও মরা', 'কালনেমির লঙ্কাভাগ' ইত্যাদি যেসব প্রবাদের উল্লেখ করিয়াছেন সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইবার উপায় নাই, কারণ ঠিক ঐসব প্রবাদই বাংলাদেশে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রচলিত আছে। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র লেখারু তাঁহার অসমীয়া রামায়ণী সাহিত্য আলোচনায় প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে রামের উল্লেখের নানা দৃষ্টান্তের বিচার করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মগ্রন্থ ও কথাকাহিনীতে রাম-চন্দ্রের বহু উপাখ্যান পাওয়া যায়। ইহা হইতে প্রমাণিত হয় যে ভারতে রামায়ণী কথা অতি প্রাচীনকালেই সুপ্রচলিত ছিল। জৈন পদ্মচরিত, বৌদ্ধ দশরথজাতক, সমজাতক, সম্বুলজাতক, বেসসন্তর জাতক, চীনদেশে হোরাজাতক প্রভৃতিতে রাম লক্ষ্মণ দশরথের কথা পাওয়া যায়। দশরথজাতকে সীতাকে দশরথের কন্যা বলিয়া অভিহিত করিয়াছে। সমজাতকে বারাণসীর রাজা অন্ধমুনির পুত্রকে শব্দসন্ধানী বাণদ্বারা নিহত করিয়াছেন এই কাহিনী আছে। এইগুলি ঠিক কোন শতাব্দীতে রচিত সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে, তবে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে রামায়ণী কথা প্রকাণ্ড বনস্পতিরূপে শিকড় গাড়িয়াছিল ইহা ইতিহাসসম্মত।

মাধবকন্দলীই রামায়ণী কবিদের মধ্যে প্রথম ও প্রধান। অসমীয়া সাহিত্যিকদের মতে অসমীয়া ভাষায় চারি প্রকার রামায়ণ পাওয়া যায় : (১) পদ রামায়ণ (২) কথা রামায়ণ (৩) গীতি রামায়ণ (৪) কীর্তনীয়া রামায়ণ।

মাধবকন্দলী, অনন্তকন্দলী, শঙ্করদেব, মাধবদেব প্রভৃতি কবিগণ বহু রামায়ণী পদ রচনা করিয়া গিয়াছেন। কবি দুর্গাবর গীতিরামায়ণকার ও অনন্তঠাকুর আতা কীর্তনীয়া রামায়ণকার বলিয়া পরিচিত। ইহা ব্যতীত শঙ্করদেব রামবিজয় বা সীতাস্বয়ম্বর, মাধবদেব রামভাওনা, অনন্তকন্দলী, সীতার পাতালপ্রবেশ প্রভৃতি রচনা করিয়াছিলেন। মন্ত্রগীতি পুঁথিতে বিয়াগীত প্রভৃতিতেও বহু রামকাহিনী স্থান পাইয়াছে।

মাধবকন্দলী নিজের আত্মপরিচয় এইরূপ দিতেছেন—

কবিরাজ কন্দলী যে আমাকে সে বুলি কয়
মাধব কন্দলী আরো নাম।
সপোনে সবিতে মঞি জ্ঞান কায়বাক্যে মনে
অহর্নিশে চিন্তো রাম রাম॥
শ্লোকে সংস্কৃতে আমি, গাঢ়িবাক পারিছয়
করিল হো সর্বজন বোধে।
রামায়ণ সুপয়ার শ্রীমহামাণিক্য যে
বরাহী রাজার অনুরোধে॥

এই বরাহী রাজা কে, এবং মহামাণিক্য কাহার উপাধি, এই লইয়া বহু তর্কবিতর্ক হইয়াছে। কামরূপের পালরাজাদের সময় আমরা ভৌমপাল ও বরাহী পালেদের নাম শুনিয়াছি। বাঙালী বৈদ্যদেব কর্তৃক কামরূপ রাজ্য অধিকৃত হইবার পর কামতা রাজ্য স্থাপন এবং পরে কাপিলি উপত্যকায় কামেশ্বর নামে ঐরাজ্যেরই পূর্বভাগ শাসনের জন্য একটি উপরাজ্য স্থাপিত হয়। ঐতিহাসিক রাজমোহন নাথ প্রাচীন কামরূপের বরাহী-পালবংশের সহিত এই রাজ্যকে সংযুক্ত করেন। ডাঃ বাণীকান্তের মতে জয়ন্তাপুরের কাছারী রাজা মহামাণিক্যের অনুরোধে 'প্রাগ্‌বৈষ্ণব যুগত মাধব কন্দলীয়ে সম্পূর্ণ রামায়ণ অসমীয়ালৈ ভাঙে। মাধব কন্দলী মধ্য অসমর অর্থাৎ বর্তমান নগাওঁর আছিল'। এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মরণ রাখা কর্তব্য যে কপিলী-উপত্যকাতেই ত্রিপুরারাজবংশের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় এবং আজ পর্যন্ত এই মাণিক্য উপাধি ত্রিপুরাধিপতিদের ভূষণ হইয়া আছে।

মহামাণিক্যর বোলে কাব্যরস কিছু দিলোঁ
দুগ্ধক মথিলে যেন ঘৃত।

মাধবকন্দলীর নিজের উক্তি যে তিনি বাল্মীকির মূল রামায়ণেরই অনুসরণ করিয়াছেন—

বাল্মীকি যে মহাঋষি রামায়ণ প্রকাশিল
সংসারত সৃজিল অমৃত।
আকশুনি নরলোক কলিত সদগতি হোক
আকশুনি হোবে কৃত্যকৃত॥
মাধবকন্দলী বিপ্রে, তাহার চরণ স্মরি
করিলন্ত শ্লোকক উদ্ধার॥

কন্দলী উপাধি কোথা হইতে আসিল, ইহা লইয়াও বহু গবেষণা হইয়াছে। কন্দলী উপাধিধারী বহু কবির নাম পাওয়া যায়, যেমন মহেন্দ্রকন্দলী, মাধবকন্দলী, অনন্তকন্দলী, শ্রীধরকন্দলী, রত্নাকরকন্দলী, রুচিনাথ কন্দলী ইত্যাদি। অনেকে মনে করেন, কন্দলে অর্থাৎ তর্কে যিনি পারদর্শী তাঁহাকে কন্দলী বলা হইত— 'তর্কত লভিলা নাম অনন্ত কন্দলী'।

এই প্রসঙ্গে আর-একটি কথা প্রণিধানযোগ্য। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রচন্দ্র লেখারু স্যার রামকৃষ্ণ গোপাল ভাণ্ডারকরের দ্বারা উত্থাপিত একটি ঐতিহাসিক প্রশ্ন উত্থাপিত

করিয়াছেন—রামকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করা হইল কবে? রামকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার বায়ুপুরাণেই প্রথম। বাল্মীকির রাম একজন উন্নতমনা বীর, ভবভূতির রাম আরো মহীয়ান। হেমাদ্রির ব্রতখণ্ড ও বৃদ্ধ হারিতের স্মৃতিগ্রন্থে রাম অবতার বলিয়া গণ্য। রামানন্দই চতুর্দশ শতাব্দীতে রামসীতা-ভক্তি প্রচার করেন। কন্দলী রামায়ণও প্রায় এই সময়ের।

শ্রীকৃষ্ণও এইভাবে ঐতিহাসিক বিবর্তনের মধ্য দিয়া 'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং' হইয়া উঠেন। সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র সেনের মতে বাসুদেব কৃষ্ণের সর্বপ্রথম উল্লেখ ছান্দোগ্য উপনিষদে (খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী)। মথুরা নগরীতে যাদব জাতির অন্তর্গত সাত্বত বৃষ্ণিকুলে তাঁর জন্ম। ঘোর আঙ্গিরস তাঁর গুরু—পুরুষ যজ্ঞবিদ্যা তিনি দান করিতেছেন। জৈন উত্তরাধ্যায়ন সূত্র, মহাভারত ও পুরাণ অনুসারে তাঁর পিতার নাম বাসুদেব। ছান্দোগ্য উপনিষদে দেবকীপুত্র কৃষ্ণ একজন মানুষ। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ব্যাকরণে (খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী) তিনি ভক্তির পাত্র ক্ষত্রিয়প্রধান। পাতঞ্জল মহাভাষ্যে (খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দী) তিনি দেবত্ব লাভ করিয়াছেন। বেসনগর গরুড়স্তম্ভে তিনি 'দেবদেব'। ঋগ্বেদের বিষ্ণুসূক্তেই আমরা প্রথম বিষ্ণুর উল্লেখ পাই। তৈত্তিরীয়োপনিষদে বিস্তীর্ণ পাদক্ষেপকারী বিষ্ণুও আমাদের কল্যাণকারী হউন। 'শংনো বিষ্ণুরুরুক্রমঃ' এই প্রার্থনা আছে প্রথম অনুবাকে। প্রাচীনকাল হইতেই বিষ্ণু ও কৃষ্ণ ও পরে রামকে আশ্রয় করিয়া বৈষ্ণব দর্শন, সাহিত্য ও চিন্তা গড়িয়া উঠিয়া বিশাল বটদ্রুমে পরিণত হইয়াছে। এই ধারা আজও সক্রিয় ও চলমান। সদ্ধর্ম পুণ্ডরীকে, মহাকবি অশ্বঘোষের রচনাতে, নাগার্জুনের লেখায়, কালিদাসের কাব্যে, বাণভট্টের কাদম্বরীতে, ভবভূতির উত্তররাম বীরচরিতে, রামকণ্ঠের সর্বতোভদ্রে, আনন্দ-বর্ধনাচার্যের ধ্বন্যালোকে, সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিতে, রামানুজাচার্য, নিম্বাকাচার্য, মধ্বাচার্য, জ্ঞানেশ্বর, বল্লভাচার্য, আলবার সম্প্রদায়ের লেখায়, নারদীয় পঞ্চরাত্রে, সাত্বত আগমনের ব্যাখ্যায়, চতুর্ব্যূহবাদে, এবং সর্বশেষ ভারতের দিকে দিকে—বিশেষ করিয়া বাংলায়, আসামে, মিথিলায়, মহারাষ্ট্রে এই বৈষ্ণবী চিন্তার ধারা সাহিত্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া মহাভারতের সৃষ্টি করে। আসামের বৈষ্ণব কবিগণ ভারতীয় সেই ধারার সহিত যুক্ত এবং বৈষ্ণব সাধনার ও সাহিত্যের ইতিহাসে মহাপুরুষ শঙ্করদেব ও তাঁর পূর্ববর্তী ও পরবর্তী কবি ও সাধকগণের দান অতুলনীয়।

মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব পূর্বকবিদের মধ্যে কন্দলীদেবকে প্রধান ও প্রথম স্থান দেন—

পূর্ব কবি অপ্রমাদী মাধব কন্দলী আদি
বিরচিল পদে রামকথা।

কথিত আছে যে, মাধবদেব আদিকাণ্ড ও শংকরদেব উত্তরকাণ্ড রচনা করিয়া মাধব কন্দলীর রামায়ণ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন। মাধবদেবের ভণিতাতেও পাওয়া যায় 'রামের চরিত্র বিরচি আছন্ত মহা মহা কবি জনে, তা সম্বাক দেখি পদকরিবাক্ স্বাদ ভৈল মোর মনে'। মাধব কন্দলীর রামায়ণের প্রতি অধ্যায়ের পূর্বে ও পরে মূল ভণিতা স্বরূপ 'শুভশুভ' ও 'ডাকি বোলা রাম রাম' প্রভৃতি 'আঁচুকুল' যোগ হইত। মাধব কন্দলীর 'দেবজিত্' বলিয়াও বৈষ্ণব ধর্মদ্যোতক আর-একটি কাব্য ছিল বলিয়া পণ্ডিতদের মত। কিন্তু এই পুস্তকের কিছু পদ যে প্রক্ষিপ্ত সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। এমন কি কন্দলীর রামায়ণেও বহু পরবর্তী কবির পদ

স্থান পাইয়াছে। শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ও মাধবদেব কন্দলী রামায়ণের যে প্রচুর সম্পাদনা করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারা নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। কারণ কন্দলীর ভণিতায় দেখি—

সাতকাণ্ড রামায়ণ পদবন্ধে নিবন্ধিলোঁ।. .
সাতকাণ্ড রামায়ণ বাল্মীকির কৃত।
তার সার উদ্ধারিয়া বিচারি সম্মত॥

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে, সাংস্কৃতিক চেতনায়, কৃত্তিবাসের রামায়ণের যে স্থান, অসমীয়া সাহিত্যে ও সামাজিক জীবনে কন্দলী রামায়ণের তদ্রূপ স্থান একথা বলিলে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না। অবশ্য ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে এইটুকু বলা দরকার যে অসমীয়া সাহিত্য বলিতে প্রাচীন কামরূপীয় বিভাগকে স্মরণ করিলেও রামায়ণী কথার প্রভাব, রামসীতার কাহিনী, আসামের অন্যত্র গিরিউপত্যকাবাসী, অহম কছারি, চুটিয়া ও অন্যান্য পার্বত্য জাতির মধ্যেও ছড়াইয়া পড়িয়াছিল।

মাধব কন্দলীর প্রধান দান হইতেছে যে রামায়ণকে সম্পূর্ণ নূতন ভাব ও ভাষায় ঢালিয়া জনচিত্তের সহিত সমতা রাখিয়া তিনি সাজাইয়াছেন। মূলের সহিত প্রধান প্রধান ঘটনার বিভেদ নাই। কিন্তু লৌকিক প্রভাব ও সাংস্কৃতিক চেতনা থাকিতে বাধ্য। ফুল ও ফলের বর্ণনায় দেখি—

খাজুরি, হারিঠা, আমলিখি ডহাফল।
ছাতিয়ান্, গুরা, নারিকেল যে শ্রীফল॥
সলঙ্গা, মহরি আরু কমলা টেঙ্গারা।
কর্দে পিছু মার্দক যে সোলঙ্গা আমরা॥
কদম্ব গুলাল পারিজাত আশেষ।
সেউতী মালতী গুটিমালি যে বিষেশ॥

পক্ষীর বর্ণনায় দেখি ঢোণ্ডাকাক, 'ময়না ঘরুবা ভাটৌশালিক . .কোকিলর বার পেচা ফিঙ্গা শুকসারী'।

বসন্ত-বর্ণনায় কবিত্বশক্তির বিকাশ দেখি অপ্রত্যাশিত ভাবে ফুলের বর্ণনায়—

দেখা দেখা জানকি! হরিষ করি মন।
ফলফুল যুকুত বিবিধ তরুবন॥
জাইযুতি বকুল বন্দুলি কর্ণিকার।
কাঞ্চন তগর কন্দ সেবালি মন্দার॥
অশোক পলাশ ফুলি গৈল হিসাহিসি।
নাগেশ্বর চম্পক ফুলিল অহর্নিশি॥

রামের প্রাসাদের যে বর্ণনা আছে তাহাকে অসমীয়া ঘরসজ্জার বর্ণনা বলিয়া অসমীয়া পণ্ডিতগণ মনে করেন, কিন্তু এই দাবী কিছুটা সত্য হইলেও সম্পূর্ণ সত্য যে নয়—সেখানে কল্পনার যে আশ্রয় আছে, তাহাও দেখা যায়—

রামর প্রাসাদ শোভে কৈলাস সমান।
বিদ্যুতের কান্তি যেন জ্বলে থানে থান॥
সুবর্ণর মাণ্ডলি চালত বলিয়াইল।
বৈদূর্য রুবলি শুম্ভ রজতেহি ছাইল॥

সুবর্ণের মাণ্ডল, বৈদুর্যের স্তম্ভ, রজতের চাল, সবদেশের কবির কল্পনাতেই স্থান পাইত—

হস্তীদন্তে বার দিলা হিঙ্গুলের কাম।
কুন্দরুখ জ্বালা থৈলা দেখি অনুপাম॥
হিৰ্মানি মাণিক জ্বলে মরকতমোতি।
প্রাসাদ উপরে দিল মাণিকর কান্তি॥
ইন্দ্রনীল মণি দিল থানে থানে জান্তি॥

তারপর প্রাসাদের চিত্রাঙ্কণের বর্ণনাও অনুপম ও অসমীয়া সংস্কৃতির একটি মূল্যবান দলিল, যদিও হিন্দুর সাহিত্যে ইহা নূতন নয়, আমরা সেখানে দেখি—

বৃষযানে শঙ্কর, সিংহবাহনে পার্বতী।
মূষিকপৃষ্ঠে গণপতি ময়ূর'পরে সেনাপতি॥
কার্তিক বামন অবতার, পাতালে বন্দীবলি।
গরুড় স্কন্ধবাহী বিষ্ণু তাহার পাশে লক্ষ্মী।
সরস্বতী বায়ু বরুণ ব্রহ্মা কুবের দেবরাজ॥

লোকাচারের অনেক তথ্য এই কাব্যে পাওয়া যায়—

আমি ভৈলো কৈকেয়ীর অষ্টমীর ছাগ।

অষ্টমীর ছাগের উল্লেখে শক্তিপূজার একটি বিশিষ্ট প্রথার প্রতি দৃষ্টি নিবন্ধ করা হইল—

হাড়ী জাতি হুয়া পঢ়িবাক চাহ বেদ।

সমাজে অন্ত্যজ হিসাবে হাড়ীজাতির স্থান যে উচ্চে ছিল না সে কথা সুবিদিত। সেই হাড়ীজাতি যদি ব্রাহ্মণ বা উচ্চবর্ণের সমান হইয়া 'বেদ পঢ়িবারে চাহে', তাহা যে সমাজসম্মত হইবে না তাহা কবির বক্তব্যেই প্রকাশ। চোদ্দ বৎসরের জন্য রাম সীতাকে লইয়া বনে যাইতেছেন, অতএব বাক্সপেঁটরা গোছাও—ইহাও সাধারণ লৌকিকতার প্রভাব—

চৌধ বরিষক লাগিয়া সীতাক
বস্ত্র অলঙ্কার লৈয়া।
পেটারিত ভরি লৈয়া ঝাণ্ট করি
সুমন্ত্র চঢ়িলা গৈয়া॥

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডে 'বালীবধে' কবি কাব্যের বিস্তারে, বর্ণনার চাতুর্যে যে সৌন্দর্যজ্ঞান সূক্ষ্মরসবোধ ও মনস্তত্ত্বের পরিচয় দিয়াছেন, বিশেষতঃ তারা পটেশ্বরীর চরিত্র অঙ্কনের, তাহাতে তাঁহাকে ভারতীয় কবিদলের মধ্যে স্থান দিতেই হয়—অবশ্য মাঝে মাঝে গ্রাম্যতাদোষ যে আসে নাই তাহা নয়। যেমন বানর-রাজ সুগ্রীব রামের আশ্বাস পাইয়া জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বালীকে বলিল—

নিচিন্তে আছহ দাদা বার্তাক নপাইলা।
তোমার কনিষ্ঠ ভাই কাল হুয়া আইলা॥

সত্য করি জানা দাদা বচন আমার।
পরিছেদা করি দেখা পুত্র পরিবার॥
পটেশ্বরী লোক দেখা আরো যত তিরী।
আজ ধরি তোমার খণ্ডাইবোঁ রাজশিরী॥

ইহাতে সুগ্রীবের চরিত্রকে ভীরু ও ক্ষুদ্র করিয়া আঁকা হইয়াছে। অবশ্য কবির ইচ্ছাও হয়তো সেইরূপ ছিল। কিন্তু বীর স্বামীর প্রতি তারার উক্তি তারা চরিত্রকে বীর্যবতী স্বামীসোহাগিনী নারীরূপেই ফুটাইয়া তোলে—

আপোনার বাহুবলে বৈর সব জিনি লাহা
বর যশরাশি তুমি পাইলা।
সুদুর্জয় রাবণক কায়ত টিপিয়া লইয়া
চারিয়ো সাগর ফুরি আইলা॥

বালীর পতনে তাহার বিলাপ ও পতিপ্রাণা নারীর বিরহবেদনার সংগে স্বামীর মৃত্যুর পরে দেবরের আশ্রয় লইতে হইবে, এই একটা অস্বাভাবিক অসমাজিক চেতনাও রহিয়া গিয়াছে—

শুনিয়ো সুগ্রীব বীর স্বামীর সোদর ভাই,
তুমি শ্রেষ্ঠ দেবর আমার।
আপনোর সুখ হেতু স্বামীক মরাইয়া মোর
কুলর আনাইল খিলিংকার।
এবে বর যশ পাইলা শ্রেষ্ঠ ভাইক ন চাইলা
আমাক চাহিবা কিবা আর॥

বালী যখন মৃত্যুশয্যায়, তখন স্ত্রীপুত্রকে সান্ত্বনা দিবার ভংগীটি সত্যই অতি মনোরম করিয়া কবি আঁকিয়াছেন—

দেখত অংগদ চরণত পরি আছে।
সব বন্ধু জনে বেঢ়ি কান্দে আগে পাছে॥
ডাইন হাতে অংগদকো আলিংগ ধরিলা।
বাম হাতে ধরিয়া তারাক বোধ দিলা॥

এবং বালীর সব চেয়ে মহত্ত্বের পরিচয় কবি দিলেন, যখন বালী নিজের গলার মালা সুগ্রীবকে পরাইয়া দিয়া বলিলেন

শ্রেষ্ঠ ভাইক্‌ লাগি ন করিবা শোক

কিন্তু সবাই কাঁদে—

স্বামীক্‌ বেড়িয়া কান্দে পটেশ্বরী লোকে।
সুগ্রীব কান্দত অতি জ্যেষ্ঠ ভাইএর শোকে॥
রামচন্দ্র লক্ষ্মণ. কান্দন্ত হনুমন্ত।
সৈন্যে সমে চারিপাত্র আর জাম্ববন্ত॥

অসমীয়া সাহিত্যের চানেকীতে প্রাক্‌বৈষ্ণব যুগের কবিতা হিসাবে রুদ্রকন্দলী লিখিত মহাভারতের দ্রোণপর্বের 'সাত্যকিপ্রবেশ' উল্লেখযোগ্য। 'বিষ্ণুর ভকত মহামায়ার সেবক' 'শ্রীমন্তভাম্রধ্বজ অনুজে সহিতে, বৃদ্ধর সমানধর্ম শিশু বয়সেতে'।

কবিরত্ন সরস্বতীও আর একজন বিশিষ্ট কবি ছিলেন। তিনিও মহাভারতের দ্রোণপর্ব অনুবাদ করিয়াছিলেন। এখানেও বিষ্ণুর প্রাধান্য—

বেদান্ত কাহিনী ব্যাসকে প্রণামি
করন্ত স্তুতি বিচার।
যতেক প্রত্যেক সকলে ততেক
একে বিষ্ণুমন্ত্র সার॥

তাঁর কৈলাসবর্ণনা অতি মনোরম। অসমীয়া কবিরা ফুলের বর্ণনায় 'কেতকী প্রচুর কনক ধুত্তুর' শুধু নয়, 'ফুলিল শেফালী, পরে হালিহোলি', মন্দার, পারিজাত সেউতি, কুন্দ, কুরুবক, তগর, জয়ন্ত, বকুল, অগুরু, লবঙ্গ, মালতী, চম্পা, নাগেশ্বর আরো কত কী।

নিছক কাব্য হিসাবে মাধব কন্দলীর উপমা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যকেই অনুসরণ করে, যেমন তিলফুল জিনি নাসা, ত্রিবলিত উদর, মুকুতার পান্তি সদৃশ দন্ত, চম্পককলিকার মত আঙুল, কম্বুতুল্য কণ্ঠ, কমলসদৃশ নয়ন ইত্যাদি। এই প্রসঙ্গে অন্য রামায়ণী কবিদের নামও করা যাইতে পারে যদিও তাঁহারা পরবর্তী যুগের। গীতিরামায়ণ ও বেহুলা-আখ্যান রচয়িতা কবি দুর্গাবর কুচবিহারাধিপতি রাজা বিশ্বসিংহের সমসাময়িক—

কমতা ঈশ্বর বন্দো বিশ্বসিংহ নৃপবর
আটচল্লিশ মহিষী বন্দো ওঠর কোঙর

নিজের বিবরণ সম্বন্ধে তিনি বলিতেছেন, 'শ্রীকায়স্থচন্দ্রধর তান পুত্র দুর্গাবর বিরচিত গীত বিতপোন'।

গীতি রামায়ণে পদ ও গানের মধ্য দিয়া রামায়ণের পুণ্যকথাকে লোকরঞ্জন হিসাবে ব্যবহার করা হইয়াছে। নানা রাগরাগিণীর সুষ্ঠু ব্যবহারে তখনকার দিনে নৃত্যগীতের যে যথেষ্ট আদর ছিল এইসকল গীতিগুলিই তাহার প্রমাণ। অধ্যাপক বাণীকণ্ঠ কাকতির মতে দুর্গাবরের গীতিরামায়ণ মূল রামায়ণের ভাষা বা ভাবানুবাদ নয়। এই মত সম্পূর্ণভাবে প্রমাণসহ না হইলেও লৌকিক ভাবের দ্বারা এইসব গীতি যে প্রভাবান্বিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ তাহারা নিজেই—

রাগ—আহির

অ কি লখ্মন,
গৈল সীতা মোক্ উপেক্ষিয়া
তৃণত শয়ন মোর বল্ক পরিধান হে . .

সহজে অঞ্চল তিরি জাতি
সম্পদে সুন্দরী নারী
আপদে পলাইলা এরি

সীতা, রামকে উপেক্ষা করিয়া পলাইয়া গিয়াছেন এরূপ গ্রাম্য কল্পনাও কবির মনে স্থান পাইয়াছে। নানা রাগরাগিণীর সাহায্যে এইসব গান গীত হইত। গুজ্জরী, ধনশ্রী, পটমঞ্জরি, সুহাই, মালশ্রী, গান্ধার, মেঘমণ্ডল ইত্যাদি বহু সুরের নিদর্শন পাওয়া যায় এই গীতগুলিতে। ওজা পালী গীত আজ পর্যন্ত আসামে আদরণীয়। অনন্ত কন্দলী শ্রীমন্ত শঙ্করদেব প্রবর্তিত ভাগবত ধর্ম প্রচারের জন্য রামায়ণ পদ

রচনা করেন। মাধব কন্দলী ছিলেন কবি, অনন্ত কন্দলী ছিলেন ধর্মপ্রচারক। পরবর্তীকালে শঙ্করদেব মাধবদেব, অনন্তঠাকুর আতা, রঘুনাথ মহন্ত, কবি শত্রুঞ্জয় ('শ্রীরামদাসর চেষ্টা শত্রুঞ্জয় নাম'), কবি গঙ্গারাম ('গঙ্গারামদাসে সীতার বনবাস রচে'), কবি ভবদেববিপ্র (শ্রীরামচন্দ্রের অশ্বমেধযজ্ঞ), কবি শ্রীচন্দ্রভারতী (মহীরাবণ বধ), কবি ধনঞ্জয় (গণকবেশী হনুমানের মাহাত্ম্যকীর্তন-গণকচরিত্র), প্রভৃতি কবিগণ রামায়ণ সম্বন্ধে পদরচনা করিয়া যশস্বী হইয়াছিলেন। গদ্যেও রামায়ণের গল্প সংযুক্ত রামকরতী নামে মন্দ্রপুঁথি এখনও পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া 'বায়ুকরতী' পুঁথি হইতে রামায়ণী কথা উদ্ধার করিয়াছেন—

"রামচন্দ্রে দেখে হনুমন্ত বন্ধ গৈলা। দেখি রামচন্দ্র অমৃত হাতে পরিশিল। রামর হাতে হনুমন্ত বীর উঠিলা। উঠি হনুমন্তে রামের চরণ পরশিলা..."

পরবর্তী যুগে কথারামায়ণ বিশেষ প্রচলিত ছিল। তাহার গদ্যের একটু নমুনা উদ্ধৃত করিতেছি। দশরথের মৃত্যুর পর ভরত রামচন্দ্রকে ফিরাইয়া আনিতে বনে গিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র বলিতেছেন—

"জলবুদবুদসম অথির শরীর তার প্রিতিসাধি পিতৃবাক্য ছারিবো..যে শরীর কৃমি বিষ্ঠা ভস্ম হৈব হেন শরীরত মোহ করি কোন দুর্জনে পিতৃরবাক্য ছাড়িব.. বনতে মোর বৈকুণ্ঠ সুখ মোক লাগি কেহ আর শোক না করিবা..ইতি শ্রীবাল্মীকি মহার্ষিকৃত অযোধ্যা কান্ডকথায়াং শ্রীরঘুনাথ কৃতয়মষ্টমোহধ্যায়।"

৪. শ্রীমন্ত শঙ্করদেব ও পরবর্তীগণ

প্রাচীন অসমীয়া সাহিত্যের গৌরবময় যুগ বৈষ্ণবযুগ এবং এই যুগের মধ্যমণি হইতেছেন মহাপুরুষ শ্রীমন্ত শঙ্করদেব, মাধবদেব ও তাঁদের শিষ্যপ্রশিষ্যগণ। বাংলাদেশে যখন 'প্রেমবন্যা নিতাই হইতে অদ্বৈত-তরঙ্গ তাতে, চৈতন্য বাতাসে উথলিল, আকাশে লাগিল ঢেউ' প্রায় ঠিক সেই সময়ে আসামে মহাপুরুষ শঙ্করদেবের আবির্ভাব। মহাপুরুষীয় সাহিত্য ও বৈষ্ণববাদ আলোচনা করিবার পূর্বে এই কথাটা বিশেষভাবে মনে রাখা প্রয়োজন যে মহাপুরুষ শঙ্করদেবের ধর্মবিজয় তখনকার দিনের বিকৃত তন্ত্রবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড অভিযান। প্রধানতঃ রামানুজের বৈষ্ণববাদের উপর ভিত্তি করিয়া তিনি একেশ্বরবাদ প্রচার করিলেন। সবচেয়ে বড় বিস্ময়ের কথা যে, এই মহাপুরুষ ব্রাহ্মণ না হইয়াও নিজের চরিত্র, বিদ্যা, বুদ্ধি ও ভগবদ্ভক্তির প্রেরণায় ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর সব জাতির গুরু হইলেন। শ্রীশঙ্কর-দেবের চরিতকার দ্বিজ রামানন্দ বলেন যে সেই সময়ে সারা কামরূপ বিকৃত তন্ত্রাচার ও ধর্মের নামে ব্যভিচারে পূর্ণ ছিল। 'রাতিখোয়া' ও 'ভোগী' দলের কথা ও কাহিনী সেদিনও শোনা যাইত। কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি এইসব কাহিনীর উদ্ধার করিয়াছেন। এই পরিবেশের মধ্যেই মহাপুরুষ শঙ্করদেবের আবির্ভাব। শঙ্করদেব শিরোমণি ভূঁইয়া চণ্ডীবর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। এই ভূইঞারা সামন্ততান্ত্রিক নরপতি ছিলেন এবং দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে রাজত্ব করিতেন। শঙ্করদেব প্রথম জীবনে অন্যান্য সকলের মত সংসারধর্ম ও গার্হস্থ্যজীবন যাপন করেন। সন্তপ্রধান ভক্ত কবীরের সঙ্গে তাঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হয়। ক্রমশঃ তিনি আচার্য রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের প্রতি আকৃষ্ট হন। কেহ কেহ বলেন যে তিনি অদ্বৈতাচার্যের শিষ্য ছিলেন ও তাঁহার নিকট শাস্ত্রাধ্যায়ন করিতেন, পরে মতভেদ হওয়ায় চলিয়া

আসেন। ইহা প্রমাণিত হয় নাই। তিনি গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবত, এই দুই গ্রন্থকেই প্রাধান্য দিতেন। আত্মিক উন্নতির জন্য সংসারত্যাগ বা সন্ন্যাসগ্রহণের বিশেষ প্রয়োজন তিনি মনে করিতেন না। সংসারের মধ্যে থাকিয়াও বিষয়-বিষ-বিকার-জীর্ণ না হইয়াও ভগবদ্‌প্রেম লাভ করা যায়, এই ছিল তাঁহার মত। তিনি ভাগবতের শুকদেবের মত বলিতেন 'গৃহে দারাসুতৈষণাং' স্ত্রীপুত্র নিয়া বাসনা দূর করিয়া 'তত্ত্বৈষণা সর্বে' তার পূর্বে নয়। সংসার মায়া নয়, মোহ নয়, মতিবিভ্রমের কারণ নয়, নিরাসক্ত ভাবে গার্হস্থ্যজীবন পালন দোষের নয়, ভারতবর্ষের সন্ন্যাসবাদ অধ্যুষিত মনে এই শিক্ষা ও দীক্ষা দেওয়া প্রায় বিদ্রোহেরই সমান। ভারতবর্ষ বলিয়া আসিয়াছে, অহং ব্রহ্মাস্মি, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো, ঋতম্ভরা প্রজ্ঞা, সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম, অয়মহংভোঃ; কিন্তু মহাবাক্যগুলির সঙ্গে তার অখণ্ড অন্বয়ের সম্বন্ধকে হয়তো পূর্ণ মর্যাদা দেয় নাই। অসীম বিশাল সত্যকে সীমার রেখায় 'মিত' করিয়া নাম ও রূপের মধ্যে ফুটাইয়া তোলাই হইতেছে 'মায়া'। শ্রীঅরবিন্দের দিব্যজীবনে নচিকেতার অভীপ্সা এই ভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন অনির্বাণ। শ্রীশঙ্করদেবও এই কথাই নিজের জীবনে কর্মের মধ্য দিয়া প্রমাণিত করিয়া গিয়াছেন।

মহাপুরুষ শঙ্করদেব রামানুজের মত ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে সীমা টানিয়া দিয়াছিলেন, সেই জন্য তাঁর মধ্যে দাস্যভাবই প্রবল—কৃষ্ণের কিঙ্কর তিনি। শঙ্করদেব কিন্তু মূর্তিপূজার পক্ষপাতী ছিলেন না। গ্রামে গ্রামে 'নামঘর' ও 'নামঘোষার' কীর্তন প্রবর্তন হইল। প্রধান প্রধান সত্র ও পাটবাটীতে 'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থসাহেবের ন্যায় পূজিত হইতে লাগিল। তিনি স্বয়ং শ্রীমদ্ভাগবত শ্রীধর স্বামীর টীকা অবলম্বনে অনুবাদ করেন। বেদান্ত, গীতা ও ভাগবতকে ভিত্তি করিয়া তিনি একশরণ নামধর্ম প্রচলন করেন। ভগবান ব্রহ্মরূপী সনাতন, পুরুষ ও প্রকৃতির দ্বৈতলীলার উপর তিনি মাধব। নাম, দেব, গুরু আর ভক্তি এই চারি বস্তুই মুক্তি আনিয়া দেয়। তাঁর সাধনা কিন্তু রাগানুরাগ মার্গের সাধনা নয়, উদ্ধবের সাধনা। 'সব সমর্পিয়া একমন হইয়া' নিষ্কিন্তু পরিপূর্ণ আত্মনিবেদন আছে, কিন্তু সে আত্মসমর্পণ মধুর রসসিঞ্চিত রাধার মহাভাবের সাধনা নয়। সেখানে 'আমার মাঝে তোমার লীলা হবে' ঠিক সেই ভাব নাই। গতির ছন্দ নাই, পাওয়ার আবেগ নাই, চাওয়ার বেগ নাই। মন বাক চিত্ত নির্বাপিত, 'শান্তম্' স্থির অচঞ্চল উপাধিবিহীন। নারদের মতে ভক্তিই পরম প্রেম। শাণ্ডিল্য একে বলিলেন পরাভক্তি। টীকাকার স্বপ্নেশ্বর ব্যাখ্যা করিলেন ভগবানের প্রতি ভক্তিই পরাভক্তি—

উপরিবা* শাস্ত্রর নীতি হইব ক্ষমাবন্ত অতি
সমস্ত প্রাণীক কর দয়া।
সত্যশৌচ ধর্ম ধরি মনত জপবা হরি
তেবে না বান্ধিবে বিষ্ণুমায়া॥

ইহা ছিল তাঁহার শিষ্য দামোদরদেবের বাণী। গুরুর অনুবৃত্তি করিয়া তিনি আরো বলিয়াছিলেন—

"তেওঁ পরমবৈষ্ণবী দুর্গাদেবীর পূজা করাতো কাকো বাধা না দিচ্ছিল, কিন্তু জীবহিংসা করি তেওঁক পূজা করিব খুজিলে বর আপত্তি করিছিল।"

* উপেক্ষা করিবেনা

মোটকথা সাহিত্যে, সংগীতে, দার্শনিক বিচারে, সামাজিক উদারতায়, শঙ্করদেব, মাধবদেব, দামোদরদেব ও তাঁহাদের শিষ্য-সম্প্রদায়রা এক প্লাবন আনিয়াছিলেন, সে কথা অস্বীকার করা যায় না। সমস্ত দিক দিয়া তাঁহারা আসামকে পুনর্গঠিত করেন। ভক্তিরত্নাবলী, ভক্তিরত্নাকর, কান্তিমালা টীকা, কালীয়দমন প্রভৃতি নাটক, বিদগ্ধমাধবের অনুবাদ, সংগীতপারিজাত, ব্রজবুলি ভাষায় বড়গীত, চারি অঙ্গ, ষড়বয়বের ব্যাখ্যা, একেশ্বরবাদ, নামকীর্তন, ব্রাহ্মণশূদ্র সব নির্বিশেষে একত্র নামগান—তখনকার বিকৃত তন্ত্রাচারের বিরুদ্ধে শুধু বিপ্লব আনিয়াছিল তাহা নয়, সমাজে একটা সুসংহত দার্শনিক মতবাদেরও সৃষ্টি করিয়াছিল, সমাজে সকলের স্থান স্বীকার করিয়া লইয়াছিল। যে কেউ 'শরণ' লইত তাহাকে শরণীয়া বলা হইত। অবশ্য তখনকার দিনে এইরূপ উদার মতবাদের বিরুদ্ধে প্ররোচনা দেওয়ার জন্য লোকের অভাব ছিলনা। রাজসভাতেও শঙ্করদেব লাঞ্ছিত হন ও তিনি দেশত্যাগ করিয়া কোচ নৃপতি নরনারায়ণের আশ্রয় গ্রহণ করেন।

ভক্ত, সাধক, যুগ-আলোড়নকারী মহাপুরুষ না হইয়াও শঙ্করদেব যদি শুধু সাহিত্যিক হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহার নাম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিত। তাঁহার নানা নাটক, ব্রজবুলির গীত, ভটিমা, ভাগবতের অনুবাদ অবিস্মরণীয় ভাবে তাঁহাকে কবিদের মধ্যেও শ্রেষ্ঠ আসন দান করে। অনবদ্য ভাব, ভাষা, পদলালিত্য, ছন্দ, রাগরাগিণীর যোজনা তাঁহাকে বিদ্যাপতি চণ্ডীদাস প্রভৃতি রসিক মহাজনদের সমপর্যায়ে ফেলে। সংস্কৃত কবি হিসাবেও তাঁর স্থান অতি উচ্চে। কানাড়া, কেদারা গোরি, বেলওয়াল, সুহাই, শ্যাম, আশোয়ারি, গান্ধার, তালজোতিমান প্রভৃতি সুর সংযোজন তাঁহাকে প্রসিদ্ধ সুরকারও করিয়াছে।

কালীয়দমন নাটকের ভটিমা, অনুপ্রাস, ছন্দ ও বর্ণবিন্যাসে কবি জয়দেবকেই স্মরণ করাইয়া দেয়—

জয় জয় যদুকুল কমল প্রকাসক নাসক কংসক প্রাণ।
জয় জয় জগতক্ ভকতক ভিতি নিতি কুরু নিরঞ্জান॥
জয় জগ নায়ক সুকৃতিদায়ক সায়ক সারঙ্গধারী।
দুষ্ট অরিষ্টক মুষ্টিক মোড়ন চোড়ন বন্ধ মুরারী॥
ধরু গোবর্ধন বারণ বরিষণ ভেলি ইন্দ্রমদদূর।
ত্রিভুবন কম্পন কালি সর্পক দর্প কয়লি চুর॥

'পত্নীপ্রসাদ' নাটেও এই ভটিমা দেখি। 'কেলিগোপাল' নাটকে প্রথম রাধার নাম পাওয়া যায়—'রাধাং বিধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজযোষিতঃ'। এই রাধার কথা প্রক্ষিপ্ত হইতে পারে। শ্রীযুক্ত কালীরাম মেধীর তাহাই মত।

নাটকটি আরম্ভ হইয়াছে অতি চমৎকার রসপূর্ণ একটি সংস্কৃত শ্লোক দিয়া—

শরৎশশাঙ্ককর কোমলাসু রীক্ষ্যেন্দুমণ্ডলমখণ্ডমকুণ্ঠ রোধো
নিশাসু শশ্বৎ সহগোপিকাভিঃ॥ বৃন্দাবনে সুকলবেণুমবাদয়ৎ যঃ॥
চকার কেলিং কলগীত নৃত্যৈঃ সম্মোহনায় মধুরং ব্রজসুন্দরীণাং
স গোপমূর্তির্জয়তীহ কৃষ্ণঃ॥ তং গোপবেশ মণিশং প্রণতোঽস্মি কৃষ্ণং॥

আবার দেখি—

এ সখি কতনু কয়ালো হাম দুখ রুখ চোর
দেহ দহে কাম আঙ্গ আলিঙ্গন কোর।

বিদ্যাপতিদেবের—

এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর—

এই বিখ্যাত পদ মনে পড়ে।

অসমীয়া কবির শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু একেবারে ঘরের মানুষ—পীতবস্ত্র দ্বারা সখীদের চোখের জল মুছাইয়া দিতেছেন। বলিতেছেন--হে সখি তোমাদের 'প্রেমভকতিত হামু পরম আকুল . . বিলাপ চোড়হ'। তাহাদের শিশুকৃষ্ণ চিরকালের সাহিত্যে অনুপম।

রুক্মিণীহরণ নাট্যের প্রথমেই দেখি কবি বলিতেছেন, ভো ভো সভাসদ তোমরা সব শ্রদ্ধান্বিত হয়ে শোনো 'রুক্মিণীহরণং নাটকং মুক্তিসাধকম্'। সূত্রাধার সমস্ত নাটকের মূল কথাটি এই কয়েকটি কথার মধ্যে অতি সুনিপুণভাবে প্রকাশ করিয়া দিলেন—'সে গোসাঁনি রুক্মিণী মিলল মিলল'। দেববাদ্য বাজিল, রুক্মিণীমঞ্চে প্রবেশ করিলেন —

রুক্মিণীং কারয়ামাস প্রবেশং সখিসংযুতাম।
মোহয়ন্ হর্ষয়ন্ চারু রূপলাবণ্য কান্তিভিঃ॥

রুক্মিণী-রূপ-বর্ণনায় কবি বিদ্যাপতিকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন—

ইসত হসিত মুখ চান্দ উজোর।
দশন মোতিম জচ নয়ন চকোর॥
মাণিক মুকুট কুণ্ডল গণ্ড ডোল।
কনক পুতলি তনু নিল নিচোল॥
করকঙ্কণ কেজুর ঝণকার।
মাণিক কাঞ্চি রচিত হেমহার॥
চলাইতে চরণ মঞ্জির করু রোল।
রূপে ভুবন ভোলে শঙ্কর বোল॥

'পারিজাতহরণ' নাটকটিও নাট্যভঙ্গীতে ও রচনাশৈলীতে মনোরম। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে ও গণচেতনায় ঢেঁকি-বাহন নারদই সর্ব অনিষ্টের কোলাহলের ও কোন্দলের মূল। এই ঐতিহ্যটি নাট্যকার তাহাঁর কাজে লাগাইয়াছেন। সূত্রধর বলিতেছেন—

"আশীর্বাদ কর কৃষ্ণক হাতে পারিজাত দিয়ে নারদ তাহেক মহিমা কহল।

নারদ॥ হে কৃষ্ণ ওহি পারিজাত্‌ক গন্ধ তিনি পহরক পথ যাই। ওহি পারিজাত যাহেক গৃহে রহে ধন জন বিভব তাহেক ছাড়ায়ে নোহি। ওহি দেবদুর্লভ পারিজাত যে নারী পরিধান করে সে পুষ্পক মহিমায়ে পরম সৌভাগিনী হয়। তাহাকে ছাড়ি স্বামী কথাব যাইতে নাহি। ওঃ ওহি কুসুমক মহিমা কি কহব ? . . (মৌনে বঠল)।"

নারদের কার্যসিদ্ধি—নাটকীয় গতিও দ্রুত। ষোড়শ সহস্র গোপিকারমণ শ্রীকৃষ্ণকে এই পুষ্পের পুণ্যশক্তিদ্বারা সম্পূর্ণভাবে আয়ত্ত করা যাইবে, এই সুযোগ কোন্ রমণী হেলায় ছাড়িতে পারে!

শ্রুত্বা কুসুমমাহাত্ম্যং রুক্মিণী কেশবপ্রিয়া
প্রণম্য স্বামীচরণং পারিজাতমযাচত।
কৌতুকে রুক্মিণী নমিয়ে স্বামীক পায়ে
মাগে আঞ্জুরি যুরি হাত
অব প্রাণনাথ মাথে মিলাবয় মোহি
ওহি কুসুম পারিজাত।

শ্রীকৃষ্ণ রুক্মিণীকেই পারিজাত দিলেন। এমন সময় নরকাসুর-বধে শ্রীকৃষ্ণের সাহায্য-লাভের জন্য সভার্যাপুরন্দর সভায় প্রবেশ করিলেন। নারদও সুযোগ বুঝিয়া সত্যভামার কাছে গিয়া রুক্মিণীকে পারিজাতদানের সরস বর্ণনা করিলেন—

"সতিনীক অভ্যুদয় দেখি কি নিমিত্ত প্রাণ ধরহ—
মুনের্বচনমাকর্ন্য শোক কোপ পরিপ্লুতা
মূর্ছিতা পতিতা ভূমৌ যথা বাতাহতা লতা।"

কলহপ্রিয় নারদ শ্রীকৃষ্ণকে আবার সেই কথা নিবেদন করিলেন—

সতিনীক উদয়ে হৃদয়ে দহে আগি
অধিক মিলাল মনতাপ।
ধিক অব জীবন যৌবন মোহে
অভাগিনী করত বিলাপ॥

সত্যভামা বলিতেছেন—কেশব, তোমার সব চাতুরী বুঝিয়াছি।

জানলোহো তুহো ব্যবহারা।
অত যে চাতুরী চোড়ি চলহু বহুরী হরি
যাহা প্রিয়া রমণী তোহারা॥

তার পর বিশ্বের চিরপ্রেমিক শ্রীকৃষ্ণের মানভঞ্জনের পালা—

শ্রীকৃষ্ণ তাহে পেখি আলিঙ্গ
কোলে তুলি বৈঠায়ল, পীতবস্ত্রে শরীরক্
ধূলি ঝারল। কেশ বান্ধল। নিজহস্তে কর্পূরতাম্বুল ভুঞ্জাবল।

এবং শুধু আদর সোহাগ নয়—পারিজাত আনিবার প্রতিজ্ঞা করাইল।

হে স্বামি আমার বহুত সতিনী
ইবার পারিজাত আনি কোন স্ত্রীক
দেব, তাহা বুঝয়ে নাহি—হামি
কদাচিৎ তোহারি সঙ্গ নাহি চাড়ব।

সাহিত্য হিসাবে ভাগবতের দশম স্কন্ধের 'বারিষা-বর্ণন' অতি মনোরম—

বহে খরবায়ু নুশুনয় মাত বোল।
গগনক ঢাকি মহা মেঘর আন্দোল॥
ঘনে ঘনে দেই অতি বিজুলী চমক।
লাগে তিরিমিরি আসি চক্ষুত জমক॥

কবির উপমা কি না 'বিদ্যুৎ সঞ্চারে চণ্ড বতাস চঞ্চল'। কিন্তু কবি উপলব্ধি করিতেছেন যে প্রকৃতির রূপ ক্ষণে ক্ষণে বদলায়, পৃথিবী শীতলা হয়—

প্রকাশে বারিষা নানা বর্ণে বসুমতী।
জলয় রাজশ্রী যেন পরম সম্পত্তি॥

কিন্তু বিজুলী চঞ্চল—সে ধীর স্থির নয়। মহাগুণবন্ত পুরুষ পাইলেও রমণীর যেমন স্থৈর্য আসে না। আবার রমণীর রূপবর্ণনায় তিনি বাংলা, মিথিলা, আসামের কোনো কবির ন্যূন নন—

কি কহব রূপ কুমারীক রাম।
কনক পুতলি তনু অনুপাম্॥
রতন তিলক লোলি অলক কপোলে।
হেরিয়ে ভ্রূভঙ্গ ত্রিভুবন ভুলে॥..
হেরিয়ে ভুজযুগ মিললউ শঙ্ক।
ললিত মৃণাল মজল জলপঙ্ক॥
আরকত করতল মুনি মন মোহা।
কনক শলকা অঙ্গুলি করু শোহা॥

এইরূপ বহু মনোরম চিত্র অসমীয়া বৈষ্ণব কবিদের লেখায় পাওয়া যায়।

শঙ্করদেবের প্রধান শিষ্য মাধবদেব। ১১৮ বৎসর বয়সে শঙ্করদেবের মৃত্যু হয়। মাধবদেবের নামঘোষা বিখ্যাত—

মুক্তিত নিস্পৃহ থিঠো, সেহি ভকতক নমো
রসময়ী মাগোহা ভকতি।
সমস্ত মস্তকমণি নিজ ভকতর বশ্য
ভজো হেন দেব যদুপতি॥

মুক্তি কাহাকে বলিয়াছেন তাঁহারা—'সকল প্রকার বন্ধনের পরা এরাই বিমল আনন্দত থাকাই হৈচে মুক্তি। আর নিস্পৃহকি—হেপাঁহন থকা—অর্থাৎ বাধা এরাই—হেপাঁই না করি কর্তব্য কামত আবন্ধ থাকা' নিরাসক্ত গৃহীর আদর্শ।

মাধবদেব সাহিত্যিক হিসাবে গুরুর অনুসরণ করেন। তিনিও অসমীয়া, ব্রজবুলি, ও সংস্কৃতে সুপণ্ডিত, সুকবি ও সুগায়ক ছিলেন। অর্জুনভঞ্জন, চোরধরা ঝুমুর, ভূমিলুটিয়া ঝুমুর, গোবর্ধনযাত্রা, জন্মরহস্য, আদিকাণ্ড রামায়ণ, নামমালিকা পোপরা গুচুরা, দধিমন্থন প্রভৃতি অসমীয়া সাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ।

চোরধরা ঝুমুরায় দেখি—শূন্যগোপীগৃহ শ্রীকৃষ্ণ নবনী চুরি করিতে গিয়া ধরা পড়িলেন—

আজু কাঁহা য়াসি বোলয়ে গোবালি।
পেখিয়ে আঁখি তরল বনমালী॥
দ্বার বেঢল গোপী বাহু প্রসারি।
লবণু চোরি কৈচে করসি মুরারি॥

কবি চমৎকার ভাবে মানবীয় ভাবটি ফুটাইয়াছেন—

ধরহ সবহি মিলি হরিক চোর।
মাধব কহ গতি গোবিন্দ মোর॥

তার পর শ্রীকৃষ্ণ পলায়ন করিলেন—'হামাকু মারি চোর পলাই' বলিয়া গোপীরা চীৎকার করিয়া উঠিল।

বালগোপালের এক একটি অপূর্ব রূপ অসমীয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যায়। এই সাহিত্য বাৎসল্যভাবে নিবিড়ঘন। শ্রীধর কন্দলীর 'কাণখোবা' কবিতা শিশুকৃষ্ণ সাহিত্যের একটি চমৎকার ছবি—ওরে কানাই কান খাওয়া আসিতেছে—

সকল শিশুর কান খাই খাই
আসয় তোমার পাশে।

মাধবদেবের পিপরা-গুচুরা নাটকে তস্করচূড়ামণি শ্রীকৃষ্ণের দধিদুগ্ধ-ভক্ষণ অপবাদের উত্তর গ্রাম্যদোষদুষ্ট হইলেও চাতুর্যে ভরা—

"আহে গোবালি, তোহে বড়ি নিদারুণ হৃদয়, আপুন জিহ্বা রাখিতে না পারি আপুন গৃহে দধিদুগ্ধ লবনু খালি আর ভাতারের ভয়ে হামাক অপযশ দেবস। আমাক ঘরে লবনু কে পুছত? খাইবার না পাই তোহারি ঘরে চুরি করিয়া লবনু খাবলো"—
ওরে গোয়ালিনী তোদের হৃদয় বড়ই নিদারুণ। নিজেদের জিহ্বা সংযত রাখিতে না পারিয়া নিজের ঘরে দধিদুগ্ধ ননী খাইয়া ফেলিনি, আর স্বামীদের ভয়ে আমার নামে অপযশ! আমার ঘরে কিসের অভাব যে তোদের ঘরে চুরি করিব?

মাধবদেব সুগায়ক ছিলেন। তিনিও বহু বরগীত রচনা করিয়াছিলেন। মাধবদেবের বরগীতের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবনেরই ছায়া। শঙ্করদেব মাধবদেবের বরগীত কবীর, মীরাবাই, দাদু, রজ্জবের দোঁহার সহিত তুলনীয়।

কানাইএর রূপ কিরকম—পুঞ্জীভূত গোপিনীর প্রেমে যেন একস্থালে রূপ লইয়াছে 'কালা নোহে শ্যামরূপ ধরিছে অমিয়া'। যেন তুলি দিয়া একটি রেখায় টানে ছবিটি জীবন্ত ও মূর্তিমন্ত হইয়া উঠিল। এযেন ঠিক বিদ্যাপতি ঠাকুরের একটি পদ—

যব গোধূলি সময় বেলি
ধনি মন্দির বাহির ভেলি
নবজলধরে বিজুরি রেহা দ্বন্দ্ব পশারি গেলি।

শঙ্করদেবের রচনাতে যে দার্শনিক গভীরতা, বিরাট্ শাস্ত্রজ্ঞান, অগাধ পাণ্ডিত্য ও সাহিত্যিক রসবিচার পাওয়া যায় মাধবদেবের কাব্যে নাট্যে কীর্তনে বরগীতে তাহা হয়তো নাই, কিন্তু বিষয়-নির্বাচনে সহজবোধ্য ভাষায় ও জনগণের মন হরণে এই লোকসাহিত্য অমূল্য।

কৃষ্ণ বা রামের (দুইই এক) নামকীর্তন এই সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য। কাব্য বা রূপ সৃষ্টি সেখানে গৌণ। ভগবদ্ভক্তি প্রচারের বাহন রূপেই ইহাদের স্বীকৃতি, তবু যে সেই পর্যায় ছাড়িয়া কাব্য ও নাটকগুলি সত্যকার সাহিত্যের স্তরে উঠিয়াছে, ইহাই তাঁহাদের কৃতিত্ব। নাম-মালিকায় শিবনাম মহিমাও কিছু পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত কাকতি মহাশয় বলেন—নামঘোষায় ত্রিধারা বর্তমান; শঙ্করস্মৃতি,

মাধবদেবের আত্মলঘিমা আর কৃষ্ণভক্তিমাহাত্ম্য। এই ত্রিধারা ছাড়া আত্মতত্ত্ব ও দর্শনের প্রতিপাদ্য বিষয়গুলিও নামঘোষায় আমরা পাই—

যে হেতু চৈতন্যপূর্ণ পরমাত্মা রূপে হরি
হৃদয়ত আছন্ত প্রকাশি।
তাতেসে ইন্দ্রিয়গণ ভূতপ্রাণ বুদ্ধিমন
প্রবর্তে যতেক জড়রাশি॥

'বিশ্বাসে মিলায় কৃষ্ণ তর্কে বহুদূর'—এই তথ্যই ভারী সুন্দর উপমায় মাধবদেব তাঁহার নামঘোষায় প্রকাশ করিয়াছেন।

'উপনিষদধেনু' ধরি খায়—কিন্তু ভাগবত-বনে হরিনামরূপ সিংহ থাকায় এই তর্কব্যাঘ্রী ভয়ে পলাইয়া যায়। তাই—

ভজ ভাই মাধবক স্মর ভাই মাধবক
গাব ভাই মাধবর গুণ

সেই অমৃতরস পান কর—

পিয়ু পিয়ু ভাই হরিনাম রস সার।

সাহিত্যহিসাবে বৈষ্ণব কবিদের সেই চিরপরিচিত তন্ময়তা আকুলতাই ইহাকে রসোত্তীর্ণ করিয়াছে।

শঙ্করদেব ও তাঁহার অনুবর্তীগণ শ্রীধর স্বামীর টীকামতে শ্রীমদ্ভাগবত ধর্মের প্রবর্তনকারী। শ্রীমদ্ভাগবতে আমরা দাস্য সখ্য বাৎসল্য মাধুর্য প্রভৃতি সব ভাবেরই বিকাশ দেখি। কত ভক্ত কতদিক দিয়া সেখানে প্রকাশ পাইয়াছেন—সূত, নারদ, ভীম, অর্জুন, যুধিষ্ঠির, ঋষভ, পৃথু, কপিল, বিদুর, উদ্ধব, প্রহ্লাদ, ধ্রুব, শুকদেব, রন্তীদেব, অম্বরীষ, ভরত, অক্রুর, অবধূত, গোপীরা, ব্রাহ্মণপত্নীরা, দ্রৌপদী, কুন্তী, দেবহুতি, যশোদা, দেবকী, রুক্মিণী, সত্যভামা। বাঙালী বৈষ্ণব কবি এর মধ্যে প্রাধান্য দিলেন সেই আগন্তুক নিত্যরসকে—কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা।

তাই নররূপ তাহার সহায়। তাই শ্রীরাধার প্রতিটি গতি, প্রতিটি ভঙ্গী, গৌড়ীয় বৈষ্ণব কাব্যে এমন বিচিত্র ভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কিন্তু অসমীয়া কবি যখন বর্ণনা করিলেন—

বন্দুলি নিন্দি অধর করু কান্তি
দাড়িম্ব বীজ নিবিড় দন্ত পান্তি
নখচয় চারু চান্দ পরকাশ
লহু লহু মত্ত গজগমন বিলাস।

তখন আমাদের চোখে একটা রূপবিদগ্ধ ছবি ফুটিল বটে কিন্তু তাহাতে রসবিদগ্ধ তন্ময়তা নাই। এইরূপ বহু বর্ণনা শঙ্করদেব, মাধবদেব ও তৎসাময়িক কবিদের লেখায় আছে যাহা কাব্যরসে টলমল করিতেছে এবং আমাদের মনের ঘোর তামসী ঘুচাইতেছে। অসমীয়া কবি এই প্রেমকে মানবীয় প্রেমরূপে চিত্রিত করেন নাই। এমনকি মানবরূপের মধ্য দিয়া রূপাতীতের সন্ধানও এ নয়। অসমীয়া কবি ভগবানকে মানুষে নামাইয়া মধুরের উপাসনা করেন নাই। তাঁর প্রিয় দেবতা হন নাই, দেবতাই প্রিয় হইয়াছেন। তিনি কৃষ্ণের কিঙ্কর শঙ্কর।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের অনুরূপ ভারতের নানা স্থানে গীতমাধব গীতবাসব প্রভৃতি গ্রন্থ রচিত হয়। দক্ষিণেও ভক্ত তীর্থনারায়ণ কৃষ্ণলীলাতরঙ্গিণী, কবি ও সাধক ক্ষেত্রজ্ঞ বহু পদাবলী, কবি জ্ঞানেশ্বর গীতার ব্যাখ্যা, কবি তুকারাম, কবি একনাথ নানা অভঙ্গ পদ রচনা করেন। ত্যাগরাজ, মুথুস্বামী দীক্ষিত, শ্যামশাস্ত্রী প্রভৃতি পরবর্তীযুগের। সারা ভারতবর্ষ জুড়িয়া বৈষ্ণব সংস্কৃতির এক উদাররূপ ব্যাপ্ত হইয়াছিল এবং মহাপুরুষ শঙ্করদেব তাহাকে আসামে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শ্যামশাস্ত্রী ছিলেন কাঞ্চীর কামাক্ষীদেবীর ভক্ত। ঐতিহাসিকেরা বলিতে পারিবেন এই কামাক্ষীর সহিত নীলাচলবাসিনী কামাখ্যার কোনো সম্পর্ক আছে কিনা। নৃত্য সহযোগে এইসব ভগব্ভক্তিমূলক গীত হইত। দেবদাসীরা প্রতি মন্দিরে এইসব পদ সুললিত স্বরে গাহিতেন। দক্ষিণে আমরা পার্বতীকে 'বীণাবাদিনী মাতঙ্গী' রূপেও দেখিয়াছি—অর্ধনারীশ্বরের কল্পনা দেখিয়াছি রাগ ও রাগিণীর যুক্ত মিলনে। মহালক্ষ্মীকেও দেখিয়াছি 'বরবীণা মৃদুপাণি'রূপে।

আসামের বরগীতগুলি সুর ও সাহিত্যের সম্মিলন।

লোচন পণ্ডিতের রাগতরঙ্গিণী অনুসারে শুদ্ধ-সপ্ত স্বরে কোমলধৈবত হইলে মূল রাগ হয়। কিন্তু শঙ্করদেব বহু সংকররাগের প্রচলন করিয়া গিয়াছেন, যেমন রাগ মধুমাধবী, তুরবসন্ত ইত্যাদি। মহাপুরুষ শঙ্করদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হইতেই অসমীয়া ওজাপালির অনুষ্ঠান চলিয়া আসিতেছে। বেহুলা লখিন্দরের গান, মনসা ভাসান, মনসামঙ্গল প্রভৃতি গ্রাম্য অঞ্চলে গীত হইত। শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত বাণীকণ্ঠ কাকতি মহাশয় বলেন, 'সাহিত্য আরু ধর্মজগত সেই বোরে নূতন যুগর আগমন সূচনা করিছিল। একালে লোকরঞ্জন আরু আন কালে অতর্কিতভাবে আধ্যাত্মিকতার ওখ আদর্শলৈ জনসমাজর মন আকর্ষণ—এয়ে অসমীয়া গীতসাহিত্যত বরগীতর ঐতিহাসিক বিশেষত্ব।' কথিত আছে যে কুচবিহারের বীর চিলারায় তাঁহার ভার্যা কমলাপ্রিয়াদেবীর মুখে 'পামর মন রামচরণে মন দেহু' এই গীতটি শুনিয়া শঙ্করদেবের শ্রীচরণে আশ্রয় নেন।

প্রত্যেক সমাজের ইতিহাসে দেখা যায় যে যখনই কোনো ভাবপ্লাবন আসিয়াছে তখনি নানা দিকে সমাজে তাহা স্ফূর্তি পাইয়াছে। বকুল কায়স্থের 'কিতাবতমঞ্জরী' নামক গণিতের পুস্তক, কবিরত্ন দ্বিজের জ্যোতিষচূড়ামণি, পুরুষোত্তম ঠাকুরের প্রয়োগরত্নমালা ব্যাকরণ প্রসিদ্ধ। অনন্ত কন্দলী ও রাম সরস্বতীর কথা পূর্বেই বলিযাছি।

প্রসিদ্ধ পদ্মপুরাণের কবি মনকর, দুর্গাবর, ষষ্ঠীবর প্রভৃতি বহু কবির নাম পাওয়া যায়। কবীন্দ্র সঞ্জয় রচিত পরাগল খাঁর অনুরোধে লিখিত পরাগলী মহাভারত চট্টগ্রামে লিখিত মহাভারত বলিয়া শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন দাবী করিয়াছিলেন। কোনো কোনো অসমীয়া সাহিত্যিক ইহাকে অসমীয়া ভাষায় পদমহাভারত বলিয়া পালটা দাবী করেন। তখনকার দিনের বাংলা ও অসমীয়া প্রধানতঃ লৌকিক সাহিত্য এবং এক মূল হইতে উৎপন্ন, এবং এখনকার দিনের ভৌগোলিক সীমার কঠিন বিচারও ছিলনা।

অনন্ত কন্দলীর কুমরহরণ, মহীরাবণ বধ, জন্মরহস্য কথাসূত্র, বৃত্রাসুর বধ প্রভৃতি বহু গ্রন্থ আছে। রাম সরস্বতীও ভীমচরিত, লক্ষ্মীচরিত, কুলাচল বধ, বথাসুর বধ, ভীষ্মপর্ব, দ্রোণপর্ব ইত্যাদি কাব্য রচনা করেন, শঙ্করদেবের আদেশে মহাভারতেরও কিছু অনুবাদ করেন। ইঁহার উপাধি ছিল ভারতচন্দ্র, ভারতভূষণ ও কবিচন্দ্র।

লক্ষ্মীচরিতে সুলক্ষণা নারীর মধ্যে লক্ষ্মী বাস করেন, এই কথা বলিতে গিয়া নারীর বর্ণনা যা করিয়াছেন তাহাতে কাব্যরসের বেশ আস্বাদন আছে—

ললিত বলিত অঙ্গ কোমল লোচনা।
ঈষত হসিত মুখ মরাল গমনা॥
গৌরবর্ণা মৃদুমিত ভাষিণী বিমলা।
মধ্যক্ষীণা দয়াবতী সর্বত্র সুশীলা॥

'ভীমচরিতে' দেখি পার্বতী শিবকে বলিতেছেন—

ভিক্ষার চাউলে জানা পেট নুপুরয়।

অতএব কৃষিকর্ম কর। এবং কি ভাবে কৃষিকর্ম করিতে হইবে তাহার মন্ত্রণা দিতেছেন।

মহাপুরুষ শঙ্করদেব মাধবদেবের বৈষ্ণব আন্দোলন রামায়ণ, মহাভারত পুরাণের নানা আখ্যায়িকার মধ্য দিয়া জনচিত্তোপযোগী কাব্যে গাথায় নাট্যে রূপায়িত হইয়া উঠে।

বখাসুর বধ, কুলাচল বধ, প্রভৃতি বধ কাব্যগুলিকে নিছক মধ্যযুগীয় allegoryর সঙ্গে তুলনা করিলে ইহার সাহিত্যরস বিচার হইবেনা। এইসব পৌরাণিক কাহিনী হিন্দু সংস্কৃতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। ইহার মধ্যে কামক্রোধ-লোভমোহমদমাৎসর্যের রূপক থাকিলেও কাহিনীগুলির সাধারণ অর্থ করাই সমীচীন—

ফান্দিলো মায়ার পাশে কাল ব্যাধে ধায়া আসে
কাম ক্রোধ কুত্তা খেদি যায়।

রত্নাকর কন্দলী, শ্রীধর কন্দলী, সার্বভৌম, গোবিন্দমিশ্র, বিদ্যা পঞ্চানন, কংসারি প্রভৃতি কবিগণ এই যুগের শঙ্করদেব মাধবদেবের সমসাময়িক। ভবানীপুরিয়া গোপাল আতা, গোপাল মিশ্র, দামোদর বিপ্র, দামোদর দাসও প্রসিদ্ধ। গোপাল আতার ঘোষারত্ন, শঙ্খচূড়বধ মহিষাসুর বধ প্রভৃতি পুঁথি আছে। পরের যুগে কবিরাজ চক্রবর্তীর লিখিত ধর্মধ্বজ কুশধ্বজের কন্যা বেদবতীর উপাখ্যান অবলম্বনে আর-একটি শঙ্খচূড়বধ কাব্য পাওয়া যায়।

চরিতকারদের মধ্যে রামচরণ, রামানন্দ ও দৈত্যারি ঠাকুর প্রধান। শঙ্কর চরিত, গুরু চরিত প্রভৃতি শঙ্করদেবের জীবনী অবলম্বনে চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের সমতুল্য। শঙ্করদেব মাধবদেবের তিরোধানের পর তাঁহাদের পূত চরিত্র ও জীবনী কাব্যে লিপিবদ্ধ করিবার একটি প্রথা দেখা যায় ও ইহা হইতেই চরিত-সাহিত্যের উদ্ভব। কৃষ্ণ ভারতীর সন্তনির্ণয়, ভট্টদেবের সৎসম্প্রদায়ের কথা, রামনাথের সন্ত মুক্তাবলী চরিতসাহিত্যকে বুরঞ্জী ও পৌরাণিক সাহিত্য ও রাজলেখমালার মধ্যবর্তী এক সাহিত্যবিভাগে পৌঁছাইয়া দেয়। এই যুগের শেষ প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠাবান সাহিত্যিক ছিলেন ভট্টদেব—তিনি দামোদরদেবের শিষ্য। এঁর কথা-ভাগবত ও কথা-গীতা তৎকালীন অসমীয়া গদ্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন। সাত্বততন্ত্র, ভক্তিসার, শরণসংগ্রহ ইত্যাদি সংস্কৃত পুস্তকেরও রচয়িতা ইনি। চরিতকথাগুলিই অসমীয়া জীবনী-সাহিত্যের আদি, ইহা অস্বীকার করা

চলে না। কথাগুরুচরিতের গদ্যরীতি সম্বন্ধে আলোচনা করিতে গিয়া সুসাহিত্যিক বিরিঞ্চিকুমার বরুয়া বলিতেছেন—

"চরিত পুথির সর্বত্রতে অপূর্ব সাহিত্যিক নিপুণতারে বর্ণনার লগত কথোপ-কথনর সংযোগ সধা হৈছে। ভাব আরু ভাষার সমতা রক্ষার্থে আর রীতি সৌষ্ঠবর হেতু দীঘল আরু চুটি বাক্যের প্রয়োগ ঘটিছে। কথ্য ভাষার স্বচ্ছন্দ সাবলীল ভঙ্গীর হেতু একেখিনি বর্ণনাতে অথবা একটি ছেদতে নির্দেশক আজ্ঞাসূচক, প্রশ্ন-সূচক আদি বিবিধ বাক্যরীতির ব্যবহার হৈছে।"

কথ্য ভাষায় গল্পের স্বাভাবিক স্রোত কি রকম সুন্দরভাবে বহিয়া যায় তাহার একটি উদাহরণ তিনি দিয়াছেন—

"কলিঙ্গ রাজার মুখত বেথা রোগ হল। পাছে দুখত রাজা এনে অঙ্গীকার করিলে বোলে মোর ব্যাধি যে এ চার পাবে তাকে মোর অর্দ্ধরাজ্য দিম। তাকে শুনি অনেক দেশের অনেক বৈদ্য ধন্বন্তরী, অর্থর্ববেদী, আহি অনেক টকা বাখর রজত সুবর্ণ ভাণ্ডি জাবণ করি খুবাই দিএ। ফোত মিছা।"

কলিঙ্গ দেশের রাজার মুখে ব্যথা রোগ হইল। দুঃখে ও কষ্টে রাজা অঙ্গীকার করিলেন যে আমার ব্যাধি সারাইয়া দিতে পারিবে তাহাকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দিবেন। এই কথা শুনিয়া অনেক বৈদ্য, ধন্বন্তরী ও অথর্ববেদী আসিয়া অনেক টাকা রৌপ্য লইয়া গেল। সবই মিথ্যা।

ইহার পরবর্তী শতাব্দীতেও বৈষ্ণব সাহিত্যের বিস্তৃতির যুগে বহু কবির নাম পাওয়া যায়। রামচন্দ্র বড়পাত্র গোহাঞির হয়গ্রীবমাধব, রঙ্গনাথ দ্বিজের চণ্ডী, নীলকণ্ঠ দাসের দামোদরচরিত্র, কেশব দাসের ভাগবত, অনন্ত আচার্যের আনন্দলহরী, লক্ষ্মীনাথদ্বিজের শান্তিপর্ব, পিথুরাজদ্বিজের মুষলপর্ব, রাম-দ্বিজের মৃগাবতী চরিত্র, বিষ্ণুরাম দ্বিজের দাতাকর্ণ, জয়নারায়ণের লক্ষ্মীপতি-চরিত্র, কামদেবের অশোকচরিত্র, রামানন্দের শঙ্করচরিত, রামানন্দদ্বিজের মহামোহ, রামমিশ্রের হিতোপদেশ, দীনদ্বিজবরের মাধবসুলোচনা, রুদ্ররাম কবির নীতিরত্ন, গঙ্গারামদাসের সীতার বনবাস, রঘুনাথদাসের কথা-রামায়ণ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

প্রত্যেক পুস্তক ও তার সাহিত্যিক অবদান সম্বন্ধে আলোচনা অসম্ভব। কিন্তু এই বিশাল সাহিত্য অবহেলার বস্তু নয়। এই বৈষ্ণব প্লাবিত যুগেও দেখি অনন্ত আচার্যের আনন্দলহরী তন্ত্রসম্মত সাধনার কাব্যে ইঙ্গিত—

নাভির মূলত মণি পূরক কমল
নীল জীমুতর বর্ণ সম দশদল
অনাহত কমলর শুনা অতি বাজে।

অনাহত কমলের ধ্বনি সাধক শুনিতেছেন—কিন্তু এই তন্ত্র-মতে সাধনা কেন?—'বৈদিক দীক্ষাত বহুশ্রম'।

কৃষ্ণানন্দ দ্বিজের পূর্ণভাগবতে 'পঞ্চ মহাভূতর আসন কহোঁ শুনা . . ইড়া ও পিঙ্গলা—নাড়ীর বিন্দু বহিছে—এহি স্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সংসঙ্গত আছে।'

দীনদ্বিজবরের মাধব-সুলোচনা নামক পাঁচালী কাব্যটি অতি মনোরম। কবির বর্ণনাশক্তি, উপমাপ্রয়োগ ও রসসৃষ্টির ক্ষমতা তাঁহার রচনাকে সার্থক করিয়াছে। নারীর বাম অঙ্গে কৃষ্ণতিল অতি সুলক্ষণ সন্দেহ নাই। কবি উপমা দিলেন—

বাম অঙ্গে আছে কৃষ্ণ তিল এক গোট।
সুবর্ণ পর্বত যেন অঞ্জনের ফোট॥

বা যেখানে বিক্রম রাজার পুত্র মাধব সুলোচনার রূপখ্যাতি শুনিয়া উচ্চৈঃশ্রবার বংশজাত ঘোটকে চড়িয়া সাগর পারে উপস্থিত মালিনীর কুঞ্জে আশ্রয় লইলেন, তখন বিদ্যাসুন্দরকেই মনে পড়ে। মালিনী সুলোচনাকে স্নানের ছলে নিদ্রিত মাধবের কাছে লইয়া গেল। গানের ধুয়ায় কবি দর্শকদের মনে কাব্যের ভাবী আভাস দিলেন—

ছার শয়নসুখ, দেখো প্রিয়ার মুখ
উঠ উঠ দেব যুবরাজ।

কিন্তু সেইদিনই সুলোচনার বিবাহের অধিবাসের দিন। কবি অতি সুকৌশলে, ঘটনার বিন্যাসে, ভাষাব আবেগে গল্পটিকে যেরূপে বহুদূর অগ্রসর করিয়া লইয়া গিয়াছেন, তাহা প্রশংসারই যোগ্য। কিন্তু কবি যে মহাশ্বেতা, যে তপস্বিনী 'বিছাল অঞ্চল স্তব্ধ অবঞ্চল' তার প্রতি কাব্যিক সুবিচার করেন নাই। কারণ তাঁর মতে—

পুরুষর অনুরাগ যিমত ভার্যাত।
নারীর নাহিক তেনে প্রীতি পুরুষত॥

অসমীয়া সাহিত্যের বৃহত্তর ইতিহাসে অঙ্কিয়া নাট একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে। কাব্যের, নাট্যের, কীর্তনের উপজীব্য বস্তু ও মূল কথা কৃষ্ণকথা প্রচার। নানা রূপে, নানা ছন্দে, নানা প্রথায় এই অমৃতনিষ্যন্দিনী কাব্যকথা পরিবেশিত হইয়াছে তৃষিত তপ্ত ক্লিষ্ট পৃথিবীর মানুষের জন্য—

ভাওনা করিবে কৃষ্ণ পূজিবে লাগিয়া।

রূপকের মধ্যে 'ব্যভিচারীভাব' থাকিবে না। ধুলিয়া নাচ, পুতুলনাচ, ঢাকঢোল জগঝম্প সহিত গান, নানা ক্রীড়া কৌতুকের সহিত নৃত্যগীত ও মুখোশ পরিয়া কথাকলি ধরনের নৃত্যগীতও প্রচলিত ছিল। ওজাপালীর কথা পূর্বেই বলিয়াছি। পার্বত্য জাতিদের মধ্যেও নৃত্যগীতের বিশেষ আদর ছিল ও আজও আছে। মনসা-পূজায় দেওধানী নাচের রেওয়াজ ছিল। শুভংকর কবির শ্রীহস্তমুক্তাবলীতে এইসব নৃত্যগীতাদির সবিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষজ্ঞদের মতে সংস্কৃত নাটক অভিনয়ে বিজয়বৈজয়ন্তীর যুগ, ষষ্ঠ ও সপ্তম শতাব্দী। দশম শতাব্দীতে কবি রাজশেখর কর্পূরমঞ্জরী প্রাকৃতে রচনা করেন। অধ্যাপক যাজ্ঞিকের মতে মধ্যযুগীয় মহানাটক অভিনয়ে প্রাচীন প্রাকৃতী রীতির কিছুটা বর্তমান ছিল। অসমীয়া নাটক এই প্রাচীন রীতি ও ওজাপালীর মিশ্রণ। অসমীয়া নাটকে আমরা সূত্রধার গায়ন ও বায়ন অর্থাৎ রীতি ও বাদ্যকার দেখি। এখানেও কিন্তু বিদূষকের অভাব। ভবভূতির নাটকেও বিদূষকের বিশেষ স্থান নাই।

অসমীয়া নাটকের ত্রিমূর্তি হইতেছে, নাট, যাত্রা ও ঝুমুর।

শিল্পশাস্ত্রমতে কলা চৌষট্টি। তন্মধ্যে নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাট্য, চিত্রকরণ, সূত্রক্রিয়ায় পুতুলনাচ, নাটকাদি দর্শন, মাল্যরচন, পুষ্পবিন্যাস, নেপথ্য বা বেশ রচনা, কেশবিন্যাস, তিলক, রচনা, কৌচুমার অর্থাৎ কুরূপকে সুরূপ করিবার সাজসজ্জা, মানসী কাব্যক্রিয়া, বৈতালিকী বিদ্যা প্রভৃতি প্রধান। স্বয়ং শঙ্করদেব নিজে চিত্রাঙ্কণ বিদ্যা অভ্যাস করিতেন। চিহ্নযাত্রায়—

তুলি হাতে লৈয়া বৈকুণ্ঠের পট আঁকিলা।

আবার দেখি—

হিঙ্গুল হারিতাল তেতিক্ষণে আনিলন্ত।
যত্ন করি পটে বৈকুণ্ঠক লিখিলন্ত॥

বৃন্দাবন-মথুরার যত লীলা—

করিলন্ত পটতাত চিত্রক তুলিলা।

অসমীয়া নাটকে সূত্রধার মধ্যস্থ পুরুষ—গ্রীক কোরাসের মত নাটকের বিষয়বস্তু দর্শকদের বুঝাইয়া দেন।

শ্রীযুক্ত কালীরাম মেধী বৈষ্ণব ও বৈষ্ণবোত্তর যুগের অসমীয়া সাহিত্যকে কাব্য-নাটক, বিজ্ঞান ও শিল্পকলা, নীতি ও লোকাচার এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন। প্রাচীন সাহিত্যের বহুলাংশই পদ্যে এবং এই পদ্যগ্রন্থের বেশীর ভাগই ধর্ম ও পুরাণ কথা অবলম্বনে। শঙ্করদেব, মাধবদেব, অনন্ত কন্দলী, রামসরস্বতী, ভট্টদেব, সার্বভৌম ভট্টাচার্য, পুরুষোত্তম গজপতি, কবি অনিরুদ্ধ, পীতাম্বর দ্বিজ, বিদ্যাপঞ্চানন, কংসারি, গোপালমিশ্র প্রভৃতি ৬১ জন কবির ও তাঁহাদের কাব্যের নাম পাই। ইহাদের মধ্যে অনেকেই 'নানাগ্রন্থ সংগ্রহ করিল এক ঠাঁই'। মহাভারতের অষ্টাদশ পর্ব, রামায়ণের সপ্তকাণ্ড, হরিবংশ, ভাগবত, মার্কণ্ডেয় চণ্ডী, স্বাতত তন্ত্র, পুরাণের উপাখ্যানই এইসব কাব্যের উপজীব্য বিষয়। প্রাচীন ওজাপালীই অসমীয়া নাটকের পূর্বরূপ। শঙ্করদেব ও মাধবদেবের নাটকের কথা পূর্বেই বলিয়াছি। কালীয়দমন, পারিজাতহরণ, পত্নীপ্রসাদ, রুক্মিণীহরণ, যে কোনো সাহিত্যের নাটকের সহিত তুলনীয়। দৈত্যারি ঠাকুরের সামন্তহরণ, রামচরণ ঠাকুরের কংসবধ, গোপাল আটার বলিছলন, মাধবদেবের ভূমি লুটুয়া, পিপরাগুচুয়া, অনন্ত কন্দলীর সীতার পাতালপ্রবেশ প্রভৃতি নাটক আজও জনমনকে আনন্দ দেয়। নিধিরামের নীতিরত্ন, পরশুরামের ধর্মপুরাণ, রামসরস্বতীর ব্যাধচরিত, দ্বিজ-গোস্বামীর হিতোপদেশ, বড়পাত্রের হয়গ্রীবমাধব, রামদ্বিজের মৃগাবতীচরিত শিব-শর্মার প্রভাসবর্ণনা কবিতায় রোমান্সের স্থান অধিকার করিয়া আছে।

জীবনী-সাহিত্য বা চরিত-সাহিত্য অসমীয়া সাহিত্যের আর-একটি বৈশিষ্ট্য। গুরুচরিত, গুরুলীলা, গুরুবংশাবলী, শঙ্করচরিত, গোবিন্দচরিত, সন্তমুক্তাবলী প্রভৃতি ২৩টি গ্রন্থের নাম ও পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি নিজস্ব ভঙ্গী ও কবিত্বরসে পূর্ণ।

রামসরস্বতীর গীতা, শঙ্করদেবের অনাদি পাতন ও ভট্টদেবের গদ্যগীতা, দর্শন ও তত্ত্ব সম্বন্ধীয় প্রধান পুস্তক।

জ্যোতিষশাস্ত্রে কবিরাজ সরস্বতীর ভাস্বতীর কথা পূর্বেই বলিয়াছি। স্বপ্নাধ্যায় ও কর্মফল বলিয়া আরো দুটি পুস্তকের পরিচয় পাওয়া যায়। জ্যোতিষ সম্বন্ধে অহমদের 'দিনচোয়া' পুঁথিকে Ahom book of Divination বলা হইত। কবিরাজ চক্রবর্তীর সূর্যসিদ্ধান্তের অনুকরণে ভাস্বতী অন্যতম। অহম রাজাদের সময় দৈবজ্ঞদের অত্যন্ত প্রভাব ছিল। প্রত্যেক সেনাবাহিনীর সঙ্গে দৈবজ্ঞ গণক থাকিতেন। তাঁহারা শত্রুপক্ষকে আক্রমণ করিবার সঠিক সময় নির্দেশ করিয়া কালাকাল বিচার করিতেন। অসম বুরঞ্জীতে দেখিতে পাই মুঘল আসাম সংঘর্ষের সময় রাজা রামসিংহের সহিত যুদ্ধকালে বিখ্যাত অসমীয়া বীর লাচিত বড়ফুকনের বাহিনীতে শ্রীঅচ্যুতানন্দ দলই লাচিতবাহিনীর আচার্যগণক ছিলেন। অভিনয়,

সম্বন্ধে শ্রীহস্তমুক্তাবলী একটি প্রামাণ্য পুস্তক। হোরা মুদ্রার ব্যবহার ইহাতে লিপিবন্ধ।

এই যুগের অসমীয়া সাহিত্যের একটি প্রধান বিভাগ বুরঞ্জী সাহিত্য। অসমীয়া বুরঞ্জীদের কথা ভারতপ্রসিদ্ধ এবং ইহার সম্বন্ধে পরে সবিশেষ আলোচনা আছে। সূর্যখরি দৈবজ্ঞের দরং রাজবংশাবলী, রতিকান্ত দ্বিজ ও সূর্য দেবদ্বিজের ও মাধবদ্বিজের রাজবংশাবলী ও রাণীরাজা এই ঐতিহাসিক সাহিত্যের পর্যায়ে পড়ে।

সঙ্গীত সাহিত্যেও অসমীয়া কৃষ্টি সমুজ্জ্বল। শঙ্করদেবের কীর্তন, মাধবদেবের নামঘোষা, বড়গীত-গীতিরামায়ণ, হৃদয়ানন্দের শ্রীরামকীর্তন এই কৃষ্টির পরিচয়। কাশীনাথের অঙ্কের আর্যা ও চাং কং ফুকনের বুরঞ্জীতে পূর্তবিদ্যার পরিচয় পাওয়া যায়।

লোকসাহিত্য হিসাবে ডাক-ভণিতাগুলি পূর্বযুগের ঐতিহ্য বহন করিলেও অনেক বচন এই যুগে পুনর্লিখিত ও লিপিবন্ধ হয়; এইগুলি সমাজবিন্যাস রীতি-নীতির পরিচায়ক।

অসমীয়া কথাসাহিত্য ও গদ্যসাহিত্যের বেশী প্রসার না থাকিলেও ইহার ক্রমোন্নতি ও ভাষা চিত্তাকর্ষক। ভট্টদেবের কথাগীতাই অসমীয়া সাহিত্যের প্রথম সাহিত্যিক গদ্য। মন্ত্রপুঁথি হইতেও গদ্যের একটু আভাস পূর্বে দেওয়া হইয়াছে। স্বর্গনারায়ণদেব মহারাজের জন্মচরিত হইতে অসমীয়া গদ্যের একটু নমুনা দিতেছি—

"পূর্বে বশিষ্ঠ মুনি দিখৌ নদীর অগ্রত বারাণসীতুল্য পবিত্র ক্ষেত্রত নির্বাস করি পুরশ্চরণ করিবকা ইচ্ছা করিলে, নদীকো বশিষ্ঠ নাম দিবলৈ ইৎসা করিলে।"

অসমীয়া ইতিহাসে Vasishta Cult বা বশিষ্ঠবাদের প্রভাব অত্যন্ত প্রবল। প্রত্যেক বুরঞ্জীতেই বশিষ্ঠের আগমন, তপ জপ ও তীর্থবাসের কথা আছে। মহারাজ কমলেশ্বর সিংহের রাজত্বকালে হরগৌরী-সম্বাদ নামে একটি পুস্তক রচিত হয়। ডক্টর প্রবোধচন্দ্র বাগচী ইণ্ডিয়ান হিস্টোরিকাল কোয়ার্টালিতে ইহার সম্যক্ সমালোচনা করিয়াছেন। এই পুস্তকটি প্রাচীন অসমীয়া কথাসাহিত্যের একটি সুচারু নমুনা।

রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাইতে পারে অসমীয়া সাহিত্যে বারে বারে মাংসপেশল গদ্যের পিছনে কলাবতী কবিতাবধূ ছায়াবৃত কটাক্ষ সহযোগে দরজার আধখোলা অবকাশ দিয়া উঁকি মারিতেছেন। বাক্ ও অবাক্ বাঁধা পড়িয়াছে কাব্যের ছন্দে।

অনেকে বলেন যে অসমীয়া বৈষ্ণব কাব্যে জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, রায় রামানন্দের পরকীয়া রস নাই এবং এই মধুর তত্ত্ব তাঁহারা পরিবেশন করিতে পারেন নাই। পূর্বেই বলিয়াছি শ্রীশঙ্করদেবের দাস্যভাবই এই মনোবৃত্তির প্রধান কারণ। আর একটি কারণ বিবৃত করিতেছি। অনাসক্ত প্রেম যে স্তরে উঠিলে 'রজকিনীরূপ কিশোরী স্বরূপ' 'কামগন্ধনাহি তায়' হইয়া প্রেমের আধারকে ভূর্ভুবস্ব ত্রিভুবন-ব্যাপী বেদমাতা গায়িত্রীর বরণীয় তেজের বিশ্বব্যাপকতার উপলব্ধিতে পৌঁছাইয়া দেয় সেই প্রেমের কল্পনা অসমীয়া বৈষ্ণব সাহিত্যে স্ফুট হয় নাই এ তথ্য স্বীকার করিলেও এই বৈষ্ণব সাহিত্যকে কিছুমাত্র ক্ষুন্ন করা হয় না। এই মধুর রসতত্ত্ব ও সাধন অর্বাচীন অনভিজ্ঞ ও অনধিকারীর হাতে দুর্বোধ্য ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইয়া ভালোর চেয়ে মন্দই করিয়াছে এর অভিজ্ঞতা কামরূপেই সহজসাধনের মধ্যেই ছিল। সহজিয়াবাদই কালে বৈষ্ণব ও তান্ত্রিক দুই মতে বিভক্ত হইয়া যায়। শক্তিবাদীর উপাস্য হইলেন শিব ও পার্বতী, ভৈরব ও ভৈরবী—সেখানেও পন্থা হইল পশ্বাচার

বীরাচারের মধ্য দিয়া দিব্যাচারে পেঁছিনো—কামময় জীবনের পরিসমাপ্তি আপ্তকাম, পূর্ণকাম হইয়া। বৈষ্ণববাদীর কাছেও তাহা মূর্ত হইল রাধাকৃষ্ণরূপে। পদ্মাবতী-চরণচারণচক্রবর্তী জয়দেবই এই বৈষ্ণবসাধনার নূতন উদ্গাতা। ভক্তের সহিত ভগবানের মিলন, ব্রহ্মাস্বাদ সহোদরের মধ্য দিয়াই—দেহের প্রত্যেক অনুভূতিই দেহাতীত ইন্দ্রিয়াতীতকে পাইবার জন্য কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা।

মনে হয় মহাপুরুষদের গভীর অন্তর্দৃষ্টি এই সত্যকে ক্ষুণ্ণ করে নাই, বরং তাঁহারা উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে পরকীয়া ভাবের মধ্য দিয়া যে রসসাধনা, জন-সাধারণকে তাহার উপযুক্ত হইতে হইলে প্রেম, ত্যাগ ও তপস্যার প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের পক্ষে অতিমানুষী ভাব প্রায় অসম্ভব। লরার প্রতি পেট্রার্ক, বিয়াট্রিচের প্রতি ডাণ্টে বা ভিটোরিয়া কলোনার প্রতি মাইকেল এঞ্জেলোর প্রেমকে আমরা platonic বা অহেতুকী বলি। গৌড়ীয় বৈষ্ণব কবিদের প্রেম শুধু অহেতুকী নয়, দেহবর্জিতও নয়—সম্পূর্ণভাবে কারণপূর্ণ—তাই অসমীয়া বৈষ্ণব কবিরা সাধনার অন্য পন্থা ধরিলেন—কৃষ্ণের কিঙ্কর তাঁরা।

অবশ্য গোপীভাব তাঁহাদের সাহিত্যে নাই, একথা বলিলে একটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি হয়। কিন্তু সেখানে অতিমানবীয় দার্শনিক আরোপ নাই। উদ্ধব যখন বৃন্দাবনে গেলেন তখন গোবিন্দের বার্তা কি, তিনি কুশলে আছেন কিনা জানিবার জন্য গোপিনীরা অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। যোগমায়া উপাশ্রিত হইয়া শারদোৎফুল্ল রজনীতে কেলিগোপাল ক্রীড়া করিয়াছিলেন। 'রেমে রমেশঃ' এই মানবীয় ভাবই প্রত্যেক গোপী স্মরণ করিতে লাগিলেন সজলচক্ষে।--

কেহো গোপী বলে কহো বান্ধব উদ্ধব
ব্রজক আসিব আর প্রাণর বান্ধব

আর একজন বলেন—

অনেক রাজার কন্যা বিহাইল মাধব
এখন আর আমাত কোন কাজ

আবার অন্যজনের স্মৃতি উথলিয়া উঠিল, এইখানেই রাসকেলি করিয়াছিলেন—

আমার কণ্ঠত কৃষ্ণ ধরি বাহুমেলি

সাধারণ প্রেমিক নরনারীর সাধারণ সম্পর্ককে মানুষী করিয়া কবি চোখের সামনে ধরিয়াছেন। দোষ-ত্রুটি নীতিজ্ঞান সব লোপ পাইয়াছে একটি গুণে—তাঁদের প্রীতিবিমুগ্ধতায়—

ভকতর বশ্য হরি জানিবা নিশ্চয়

এবং

তাঙ্ক লাগি তুমি যি যত আকুল
তোমাসাক লাগে কৃষ্ণ তেনয় ব্যাকুল

গোপীভাব যে তাঁরা জানিতেন না তাহা নয়—কিন্তু ব্রহ্মার দুর্লভ ভাব—লক্ষ্মী-দেবীও নারায়ণের বক্ষে থাকিয়াও যে রস পান না সে রসের সাধনা সাধারণের জন্য নয়

এই তথ্যও তাঁহাবা জানিতেন। সেই জন্যই শ্রীরাধার বিশেষ আবির্ভাব তাঁহাদের সাহিত্যে নাই। অবশ্য মাধবদেবের গীতকবিতায়, রামসরস্বতীর গীতগোবিন্দে ও কলাপচন্দ্রের রাধাবিজয়ে শ্রীরাধার একটি পূর্ণচিত্র অসমীয়া সাহিত্যে আছে, একথা সাহিত্যিকরা বলেন। অসমীয়া সাহিত্যের রাধার মধ্যে শিশুসুলভ দুষ্টামিই আছে, আদিরসাত্মক তীব্রতা নাই। শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণকে চোর অপবাদ দিতেছেন, ভর্ৎসনা করিতেছেন, আবার আলাপ করিতেছেন এই পর্যন্ত। যদিও উদ্ধব গিয়া দেখিলেন যে অস্থিচর্মসার হইয়া 'রাধিকা গোসানী কৃষ্ণ চিন্তায় মগ্ন'।

৫. বুরঞ্জী সাহিত্য

পূর্বপুরুষের প্রণাম আমাদের সংস্কৃতির একটা পুণ্য অঙ্গ। কিন্তু আমাদের দুর্নাম যে ভারতবর্ষে ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয় না। পিতৃপুরুষদের শ্রদ্ধা তর্পণ করি, বলি 'তৃপ্যন্তু', কিন্তু তাঁহাদের শৌর্য বীর্য, ক্ষয় ক্ষতি, কথা ও কাহিনীর খবর রাখিনা। এ দুর্নাম সত্য কি মিথ্যা, সে সম্বন্ধে নানা মতভেদ থাকিতে পারে। আসামে বুরঞ্জীকার অতি কৃতিত্ব, শ্রদ্ধা ও আগ্রহের সহিত দেশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। এই বুরঞ্জীগুলি বহু প্রাচীন নয়, ও তাহাদের ঐতিহাসিকতাকে নানাভাবে কষ্টিপাথরে বিচার করিতে হয়, ইহাও সত্য; তবে কয়েকটি বুরঞ্জীতে সাহিত্যিক সম্পদ ফুটিয়া উঠিয়াছে, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই। বুরঞ্জীর মধ্য দিয়া অসমীযা গদ্যও সম্পূর্ণ রূপ পাইয়াছে। ডাঃ গ্রিয়ারসন্ লিখিতেছেন—

The Assamese are justly proud of their national literature. In no department have they been more successful than in a branch of study in which India as a rule is curiously deficient. The historical works of Buranjis are numerous and voluminous.

আসামে বুরঞ্জীগুলি প্রধানতঃ কৌলিবিবরণী হিসাবে অহমরাজগণ ও তাঁহাদের পাত্রমিত্র অমাত্যদের কাহিনী। ঐতিহাসিকেরা এই কাহিনীগুলির বিচার-বিশ্লেষণ করিয়া সাময়িক ঘটনাপুঞ্জের এক আলেখ্য প্রস্তুত করিয়া লইয়াছেন। সাহিত্যিক ও রসবেত্তার বিচারেও এই বুরঞ্জীগুলি মূল্যবান। এই প্রসঙ্গে আসাম গভর্নমেণ্টের Department of History ও Antiquarian Studies বিভাগের অধ্যক্ষ ডাঃ শ্রীযুক্ত সূর্যকুমার ভূঞার দান সম্বন্ধে কিছু না বলিলে বুরঞ্জী সাহিত্যের কথা অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। লোকচক্ষুর অন্তরালে এই মনীষী প্রায় একক আসাম বুরঞ্জী-সাহিত্যের সংগ্রহ সম্পাদনা ও আলোচনা করিয়া শুধু আসাম নয় সমগ্র ভারতবর্ষের ইতিহাসে কৃষ্টিবিচারের এক নূতন দিক খুলিয়া দিয়াছেন, তাহার সম্যক্ পরিচয় অনেকেই জানেন না। তিনি শুধু ঐতিহাসিক নন, কবি, গল্প-লেখক, প্রবন্ধকার এবং শুধু অসমীয়া নয়, ইংরেজী ও বাংলাতেও লিখিয়া থাকেন। তাঁহার বড়ফুকনর গীত (বদনচন্দ্র বড়ফুকন্, যিনি ব্রহ্মবাসীদের আসামে লইয়া আসেন), তাঁহার আসাম জীয়রী (রানী জয়মতী ও অন্য নারীদের পুণ্যকাহিনী), পঞ্চমী, আমিনা, ঊষা, বিজুলী, শিলা না হই ফুল প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য রসসৃষ্টি।

তাঁহার কবিতাপুস্তক নির্মালি (নির্মাল্য) স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ-দ্বারা 'অসমীয়া ভাষার মধ্যে আধুনিক কালের বাধামুক্ত গীতোচ্ছ্বাসের প্রবাহ' বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল।

মোটামুটি অসমীয়া বুরঞ্জীদের পরিচয় এইরূপ—

১. আসাম বুরঞ্জী—কাশীনাথ তামুলী ফুকন ও রাধানাথ বরবরুয়া ও হরকান্ত বরুয়া কর্তৃক ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত। ইহাতে ১২২৮ খ্রীষ্টাব্দে হইতে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত স্বর্গদেব অহমরাজদের কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে।
২. কামরূপ বুরঞ্জী—অসম মুঘল যুদ্ধের এক প্রাচীন কাহিনী।
৩. তুঙ্গখুঙ্গিযা বুরঞ্জী—১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮২৬ সাল পর্যন্ত তুঙ্গখুলিয়া অহম রাজাদের কাহিনী।
৪. দেওধাই অসম বুরঞ্জী—প্রাচীনকাল হইতে ১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দ অর্থাৎ রাজা জয়ধ্বজ সিংহের রাজত্বকাল পর্যন্ত বিবরণী। ইহাতে রাজাদের বিবাহ, জ্যোতিষতত্ত্ব, দৈবজ্ঞদেব ক্রিয়াকলাপ, অন্য রাজন্যবর্গের সহিত সম্পর্ক, আতো বুঢ়াগোঁহাইয়ের ইতিহাস লিপিবদ্ধ আছে।
৫. আসামের পদ্যবুরঞ্জী—দ্যুতিরাম হাজারিকা ও বিশ্বেশ্বর বিদ্যাধিপ কর্তৃক ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত পদ্যে ইতিহাস।
৬. কাচারী বুরঞ্জী—প্রাচীন কাচারের ইতিহাস অবলম্বনে প্রাচীনকাল হইতে কাচারী রাজা তাম্রধ্বজনারায়ণ ও অসমীয়া নৃপতি স্বর্গদেব রুদ্র সিংহের রাজত্বকাল পর্যন্ত একটি প্রাচীন কাহিনী।
৭ জয়ন্তিয়া বুরঞ্জী—প্রাচীন জয়ন্তিয়ার ইতিহাস অবলম্বনে প্রাচীনকাল হইতে জয়ন্তিয়ারাজ রাজা লক্ষ্মীসিংহ ও অসমীয়া নৃপতি স্বর্গদেব শিবসিংহের রাজত্বকাল পর্যন্ত একটি ধারাবাহিক কাহিনী।
৮. ত্রিপুরা বুরঞ্জী—রত্নকন্দলী ও অর্জুন বৈরাগী নামক ত্রিপুরা রাজসভায় রাজা রুদ্রসিংহের দুই দূতের দ্বারা লিখিত ত্রিপুরারাজ্যের সমসাময়িক ঘটনার কাহিনী।
৯. অসম বুরঞ্জী—গৌহাটির সুকুমার মহান্তির নিকটে প্রাপ্ত 'অসম বুরঞ্জী' অহমরাজ্যের একটি সম্পূর্ণ ধারাবাহিক ইতিহাস। ডাঃ ভূঞার মতে লাচিত বড়ফুকনের দৈবজ্ঞপ্রধান সমুদ্রচূড়ামণিই ইহার রচয়িতা। ডাঃ ভূঞা বলেন "The book is a historical classic and a literary masterpiece of the first order, parallel to which very few vernacular literatures of India possess"
১০. পাদশাহ বুরঞ্জী—সপ্তদশ শতাব্দীর একটি অসমীয়া বুরঞ্জী। ইহাতে প্রথম মুসলমান আক্রমণ ও পিথোর রাজা হইতে মুঘলবংশের সুলতান আজম তারা পর্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে বলা যায় যে, 'বহরীস্তানই ঘয়বী' বা গৌহাটির মুঘল ফৌজদার মীর্জানথান, মুঘলদের বঙ্গ, বিহার, আসাম, উড়িষ্যা বিজয়ের পারসিক ভাষায় লিখিত পুস্তকে এই সময়ের বঙ্গ ও আসামের অনেক তথ্য পাওয়া যায়।

ডাঃ ভূঞার মতে এইসব গ্রন্থ ছাড়াও ঐতিহাসিক ঘটনা সম্বলিত বহু বুরঞ্জী পাওয়া যায়—যাহার সাহিত্যিক মূল্য ও ঐতিহাসিক তথ্য দুইই আছে। যেমন

ভবানীপুর গোপালদেব বিরচিত নরনারায়ণ চিলারায়ের অসম আক্রমণের কাহিনী, ভদ্র চারুদাস প্রণীত গদাধর সিংহের বৈষ্ণবনির্যাতন, রুদ্রসিংহের মোহন্তদের পৃষ্ঠপোষকতা, মোযামরীয়া বিদ্রোহের কাহিনী হিসাবে 'ধর্মোদয়' নামে নাটক, সতী জয়মতীর গীত, রাধারুক্মিণীর গীত, মনিরাম দেওয়ানের গীত। তাহা ছাড়া 'দরংরাজবংশাবলী'তে কোচ রাজাদের আদিকথা ও দরং রাজাদের ইতিহাস পাওয়া যায়। দরংরাজবংশাবলীর দ্বিতীয় খণ্ড সূর্যদেবদ্বিজ কর্তৃক রাজা গৌরীসিংহের সমসাময়িক দরংরাজের ভ্রাতুষ্পুত্র গন্ধর্বনারায়ণের আদেশে রচিত হইয়াছিল।

প্রত্যেক বুরঞ্জী ও তাহাদের সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক মূল্য নিরূপণ এখানে সম্ভব নয়। দু'একটি বুরঞ্জীর সামান্য আলোচনা করা যাক। অসম বুরঞ্জীর প্রথমেই প্রথম অধ্যায়ে অহম স্বর্গদেবেদের উৎপত্তির কথা লিখিত আছে। কিম্বদন্তী যে, বশিষ্ঠের অভিশাপে শ্যামাবিদ্যাধরীর গর্ভে ইন্দ্রের ঔরসে প্রথম স্বর্গনারায়ণ-দেবের উৎপত্তি। অন্য এক বুরঞ্জীতে দেখি ইন্দ্র বলিতেছেন—

"আমি সকলো দেবতার মধ্যে রাজা তথাপি আমার সন্তানর পৃথিবীত রাজত্ব নাই। অতএব মোর সন্তানকো প্রিথিবত রজা হবলৈ পঠাও। এই বলি লাউখে অর্থাৎ বিশ্বকর্মাক আজ্ঞা দিলে। পাচে বিশ্বকর্মাই চোমদেও নামে ইন্দ্রর মনোগত-রূপে জন্ত্র তৈয়ার করি দিলে..খুনলুঙগ খুনলাই দুইকে পঠাবলৈ জনালত ইন্দ্রে স্বিকার করি এই আজ্ঞা করিলে বোলে খুনলুঙগ তুই বর, রজা হবি, খুনলাই সরু তোর লাগত জুবরাজ রূপে থাকিব।"

অন্য একটি কিম্বদন্তী এইরূপ (ইন্দ্রবংশীয় রাজার বিবরণ, আসাম বুরঞ্জী)—

"শোণিতপুর বা ইদানীক তেজপুর জিলার অন্তর্গত ভৈরবী নদীর পরা দিক্করবাসিনী অথচ উজান সদিয়া কেচাইখাঁতী পর্যন্ত সোমার পীঠ বোলে..এক সময় শচি ও ইন্দ্র উভয়েই কামোন্মত্ত হৈ আনন্দে ক্রীড়া করি ফুরিছিল। সেই পর্বতর গুহাতে বশিষ্ঠ মুনি থাকে। তারে পরা স্নান করিবলৈ যাঁওতে তেওঁর পুষ্পবাটিকাতে ক্রীড়া করা দেখি কুপিত হৈ ইন্দ্রদেবতাক অন্ত্যজ ও অন্ত্যজস্ত্রীত পতিত হওক্ বুলি শাপ দি.."

কথাসাহিত্য হিসাবে ও ভাষার মিশ্রণ ও বিকাশের পদ্ধতি হিসাবে এই বুরঞ্জী-গুলি মূল্যবান।

প্রায় ছয় শত বৎসর ধরিয়া অহমরা ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় ও তন্নিকটবর্তী রাজ্য-উপরাজ্যগুলিতে আধিপত্য করিয়াছিল। প্রাচীন কামরূপীয় ভাষার উপর তাহাদের আনীত মনখমের টাই ভাষার কিছুটা প্রলেপ পড়িয়াছিল। কিন্তু বিজেতারাই ক্রমশঃ বিজিত হইয়া পড়িয়াছিল এবং ধর্ম, সাহিত্য, জ্ঞান-বিজ্ঞান সব বিষয়ে হিন্দুভাবাপন্ন হইয়া নিজেদের নাম পর্যন্ত পরিবর্তিত করিয়াছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে অহমরাজ স্বর্গদেব প্রতাপ সিংহের (১৬০৩-১৬৪১ খৃষ্টাব্দ) সময় অহম মুঘল সংঘর্ষ বাধে। মীরজুমলা অহমদের পরাজিত করিয়া সন্ধিপত্র করেন। সেই দলিলটির যে রূপ অসম বুরঞ্জীতে পাওয়া যায় সেটি হিন্দুস্থানী অসমীয়া সংস্কৃত, ফারসির এক সংকর ভাষা। 'লিখিতং শ্রীরাজা জয়ধ্বজ সিংহ রাজা আচাম সুলতান সুজাকে খলমকে উক্ত' ইত্যাদি। এই বুরঞ্জীতে কয়েকটি কূটনৈতিক পত্রের সারমর্মও উদ্ধৃত আছে। সেইগুলির সাহিত্যিক মূল্য কম নয়—যেমন কোচ নৃপতি প্রাণনারায়ণ লিখিলেন—আপনিও রাজা হারাইয়াছেন, আমিও তদ্রূপ আমরা দুইজনেই রাজ্য ফিরিয়া পাইয়াছি। রামচন্দ্র, সুরথ, যুধিষ্ঠিরও একদিন রাজ্য হারাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহাদের

মহাগৌরবের কিছুমাত্র লাঘব হয় নাই—আমাদের দুই রাজ্যের মধ্যে যেন বন্ধুত্বের সূত্র ছিন্ন না হয়। অহম রাজও তার প্রতিধ্বনি করিয়া বলিলেন—বন্ধু, সূর্য একবার অস্ত গেলেও পুনরায় প্রাতে উদিত হয়, আমি পুনরায় যুদ্ধের আয়োজন করিতেছি, আপনিও করুন।

সন্ধির শর্তানুযায়ী আওরংগজেব প্রদত্ত 'খেলাত' যখন দিল্লীশ্বরের দূতেরা মহারাজ চক্রধর সিংহকে উপহার দিয়া দরবারে পরিবার জন্য অনুরোধ করেন তখন তিনি চীৎকার করিয়া বলেন—স্বাধীনতার চেয়ে এক প্রস্থ কাপড়ই কি বেশী মূল্যবান—এর চেয়ে মৃত্যু শ্রেয়।

দ্যুতিরাম হাজারিকা বিরচিত 'কলিভারত বুরঞ্জী' ও বিশ্বেশ্বর বৈদ্যাধিপ বিরচিত 'বেলিমারব বুরঞ্জী' এই দুইটি পুস্তক 'অসমর পদ্য বুরঞ্জী' নামে সম্পাদিত হইয়াছে।

"প্রাচীন অসমীয়া পদপুথি কীর্তন, বারস্কন্ধ ভাগবত, রামায়ণ মহাভারত আদি বৈষ্ণব সাহিত্যত যি ভাষা ব্যবহার করা হৈছিল এই বুরঞ্জীতো সেই ভাষা ব্যবহার করা হৈচে।

পূর্বে রণ ভৈল যেন বলী বাসবর
বিষয় অনিত্য জানি ভজিয়োক চক্রপাণি
গুচিবে সংসার দুঃখ ভয়।"

চন্দ্রকান্তর জগন্নাথমূর্তি দর্শন সম্পর্কে কবির বর্ণনা যে কোনো প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব কবির সমতুল্য—

মেঘসম শ্যাম তনু গায়ে পীতবাস
সজ্জল মেঘত যেন বিদ্যুৎ প্রকাশ।

পাদশাহ বুরঞ্জী একটি বিশিষ্ট ধরনের বুরঞ্জী। মুসলমান রাজত্বের প্রথম হইতে মুঘলবংশের আওরংগজেব, আজমতারা পর্যন্ত অসমীয়ার দৃষ্টিতে সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত এক কাহিনী। পিথোর রাজা, তৈমুর, হুমায়ন, শের শা, জাহাংগীর, মানসিংহ, শাহজাহান, মমতাজমহল, মীর্জারাজা জয়সিংহ, দারাশিকো, সুলতান সুজা, শায়েস্তাখাঁন, শিবাজী, গুরু তেগবাহাদুর, রামসিংহ, মীরজুমলা, আজমতারা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নানা কাহিনী অতি সুন্দর ভাবে ও ভাষায় বর্ণিত হইয়া ইহাকে কথাসাহিত্যে পরিণত করিয়াছে।

ত্রিপুরা বুরঞ্জীও এইরূপ একটি বিশিষ্ট ধরনের বুরঞ্জী। 'এই বুরঞ্জীর ভাষা সহজ, গতিময় ও উচ্চাংগের। কাহিনীগুলি সুন্দরভাবে সজ্জিত, প্রত্যেক কাহিনীর পূর্বে কয়েকটি বাক্যে এমন করিয়া ভূমিকা জুড়িয়া দেওয়া আছে যে, আখ্যায়িকাকে অনুসরণ করিতে কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। আসামের বাহিরে বহু দেশের পণ্যদ্রব্য ও আচার-বিচারের বর্ণনা করিতে গিয়া লেখকদ্বয় (কটকী রত্নকন্দলী শর্মা ও অর্জুনদাস বৈরাগী—মহারাজ স্বর্গদেব রুদ্রসিংহের ত্রিপুরারাজ্যে দূতদ্বয়) অনেক বৈদেশিক কথা ব্যবহার করিয়াছেন যাহা ভবিষ্যৎ ভাষাতত্ত্ববিদের পক্ষে শিক্ষণীয় ও বিচারের বস্তু হইবে। মোটের উপর সমস্ত ত্রিপুরা বুরঞ্জী তৎকালীন অসমীয়া গদ্য ও ঐতিহাসিক সাহিত্যের নমুনাহিসাবে সাধারণ বুরঞ্জীর উপরে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।'

এই বুরঞ্জীতে তৎকালীন ত্রিপুরার ও বাংলা সমাজের একটি অতি মনোরম চিত্র পাওয়া যায়, যেমন 'ত্রিপুরা কটকীর রংপুরত দুর্গোৎসব দর্শন' 'ত্রিপুরাত মদনপূজার আড়ম্বর', ত্রিপুরা রাজার পূর্বপুরুষের কথা। এই বুরঞ্জীতে সংস্কৃত-বহুল দীর্ঘলিপিগুলি স্থান পাইয়া পত্রসাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। এই সংস্কৃত লিপিগুলির সমাসের গতি থামিতে চাহেনা, বিশেষণের পর বিশেষণ বসিয়া আপ্যায়নের চূড়ান্ত হইতে থাকে। সমাসবিন্যাসের প্রবল ধারায় ইহা কাদম্বরীকেও হার মানাইয়াছে। যেমন—

"স্বস্তি শ্রীমদ্ভবানী-পদ-পঙ্কজ ধূলিপটল-রঞ্জিত-মনোমত্ত-মধুব্রতানবরত বিস্রাবণ দূরীকৃতি দুর্গতি দারিদ্র, করকলিত-নিস্ত্রিংশধারা-জর্জরীকৃতাশেষ-রিপুকুল নয়-বিনয়-নৈপুণ্য-বশীকৃতাশেষ-দ্বিজ-সজ্জন, কর্পূর-পাণ্ডুর যশঃপুর-পরিপূরিত-সমস্তাশামণ্ডল, বিবিধগুণসম্পন্ন-জন-মণ্ডিত-নিজাবাসস্থল, সকল শাস্ত্রবিশারদ-বুধমণ্ডলী-পরিমণ্ডিত গোষ্ঠিকেষু শ্রী শ্রীযুত রুদ্রসিংহ-মহারাজাধিবাজ-মহামহোগ্র-প্রতাপেষু। প্রবৃত্তি-নিবেদয়িত্রী পত্রীয়মুজ্জৃম্ভতে।"

৬. বর্তমান যুগ ও ভবিষ্যতের ইঙ্গিত

১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে আসামে ইংরাজশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐসময় হইতে অসমীয়া সাহিত্যের বর্তমান যুগের সূচনা বলা যাইতে পারে। এই সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা এখানে সম্ভব নয়। শুধু বর্তমান সাহিত্যের ধারা ও প্রগতির রূপ মহাকালের ইতিহাসে ভবিষ্যতের কি ইঙ্গিত বহন করিতেছে সেইটুকুই বক্তব্য। ঊনবিংশ শতাব্দী ও বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদ পর্যন্ত কয়েকটি প্রসিদ্ধ লেখকের সামান্য সাহিত্যিক পরিচয়ও দিতেছি।

ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে অসমীয়া ভাষা বিশেষ প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। তাহার কয়েকটি প্রধান কারণ হইতেছে—

১. বাংলা ভাষা ও অসমীয়া ভাষা আপাতঃদৃষ্টিতে সমধর্মী ও এক গোত্রজ। তাহাদের মধ্যে বিচারান্তে বিভেদ পণ্ডিতদের দৃষ্ট হইলেও সামাজিক সাধারণ মানুষের কাছে তাহা ছিল অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত।
২. বাংলা ও অসমীয়ার দুই-এর এক কুটিলা লিপি (script) ব্যবহার।
৩. মহাপুরুষ শঙ্করদেবের যুগে বৈষ্ণব সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বাহন হিসাবে মগধগৌড়কামরূপে এক ব্রজবুলি ব্যবহার তাহাদের মধ্যে ঐক্যের সূত্র গ্রথিত করিয়াছিল।
৪. অসমীয়া ভাষা কামরূপীয় ভাষার (অর্ধমাগধীর অপভ্রংশ) সহিত যুক্ত হওয়ায় ও প্রধানতঃ ব্রহ্মপুত্র উপত্যকায় নিবদ্ধ থাকায় অন্য উপজাতিদের মধ্যে তাহার প্রসার হয় নাই।
৫. বহু প্রাচীন যুগ হইতেই গৌড় মগধ মিথিলা হইতে দলে দলে আর্যভাষা-ভাষী লোকেরা কামরূপে প্রবেশ করিয়াছে। ব্রিটিশ শাসনের প্রথমেও সেই ধারার পুনরাবৃত্তি দেখি বিশেষ করিয়া বাঙালীদের মধ্যে। তাহারও পূর্বে অহমরাজ রুদ্রসিংহ, রানী ফুলেশ্বরী, রাজা শিবসিংহ প্রভৃতির

রাজত্বকালে পদ্মনাভ শর্মা (মুকুলমোরিয়া গোস্বামী) কৃষ্ণরাম ভট্টাচার্য আগমবাগীশ (পর্বতীয়া গোস্বামী) প্রভৃতি বাঙালীগণ বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতিকে আসামে লইয়া আসিয়াছিলেন।

৬. ইহা ব্যতিরেকে তখনকার দিনে কলিকাতাই ছিল সমস্ত পূর্ব ভারতের সংস্কৃতির কেন্দ্র—প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সভ্যতার মিলনভূমি এবং বাঙালী মনীষীদের দ্বারা প্রভাবান্বিত।

৭. ব্রিটিশ শাসনের প্রথম যুগে আসাম বাঙলার সহিত যুক্ত ও বাঙালীরাই রাজকার্যে নিযুক্ত।

ব্রিটিশ শাসনের আরম্ভের চারি বৎসরের মধ্যেই দেখি হোলিরাম ঢেকিয়াল ফুকন বাংলা ভাষায় আসামের ইতিহাস লিখিতেছেন। ১৮৩০ সালে লণ্ডন হইতে প্রকাশিত এশিয়াটিক জার্নাল মে-আগস্টে ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দে বুরঞ্জী সম্বন্ধে শ্রীতারাচাঁদ চক্রবর্তীর (ইণ্ডিয়া গেজেটের) এক সুদীর্ঘ সমালোচনা দেখি। এই প্রথম যুগে আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, কাশীনাথ তামুলী ফুকন ও রাধানাথ বরবরুয়া বিশিষ্ট লেখক। মণিরাম দেওয়ানের বিদ্রোহ ও তাঁহার লিখিত বুরঞ্জী বিবেকরত্ন ইহাতে ইন্ধন জোগাইয়াছিল এবং ব্রাউন ও ব্র্যানসন প্রভৃতি ব্যাপটিস্ট মিশনরীদের আপ্রাণ চেষ্টা অসমীয়া ভাষাকে নিজবাসভূমে পরবাসী না করিয়া আত্মপ্রতিষ্ঠিত হইতে সুযোগ দিয়াছিল। এই বুরঞ্জী বিবেকরত্ন অসমীয়া ও বাংলা ভাষার মিশ্রণে লিখিত ও পুরাতত্ত্ব বিভাগে রক্ষিত।

আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের প্রধান দিগ্‌দর্শন ১৮৪৬ খ্রীষ্টাব্দে অরুণোদয় প্রকাশ। এই বৎসরে আধুনিক অসমীয়া সাহিত্যের জন্ম বলা যাইতে পারে এবং এর বিকাশের ইতিহাস তাহার পরের একশত বৎসরের ইতিহাস। তাহার পর আসাম-বিলাসিনী, আসাম-মিহির, আসাম-দর্পণ, আসাম-দীপক, আসাম-নিউচ, জোনাকী, আবাহন প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় কবিতা গল্প প্রবন্ধের প্রাচুর্য অসমীয়া সাহিত্যকে তাহার অদ্যকার স্থানে লইয়া আসিয়াছে। আনন্দরাম ঢেকিয়াল ফুকন, গুণাভিরাম বরুয়া ও হেমচন্দ্র বরুয়া বিশেষভাবে স্মরণীয়। স্বল্পায়ু ঢেকিয়াল ফুকনের নিবন্ধাবলী, হেমচন্দ্রের 'হেমকোষ' অভিধান ও অসমীয়া ব্যাকরণ ও গুণাভিরামের সন্দর্ভনিচয় ঊনবিংশ শতাব্দীর অসমীয়া সাহিত্যকে নব-জীবন দান করিয়াছিল। অভিমন্যুবধ-কাব্য প্রণেতা রমাকান্ত চৌধুরী, পদ্যবুরঞ্জী লেখক দুতিরাম, ভোলানাথ দাস, লম্বোদর বরা, রত্নেশ্বর মহান্ত, সত্যনাথ বরা, সাহিত্য-সম্রাট লক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া, চন্দ্রকুমার ও আনন্দ আগরওয়ালা, রজনীকান্ত বরদলৈ, হেমচন্দ্র গোস্বামী, বেণুধর রাজখোওয়া, পদ্মনাথ বরুয়া, হলিরাম মহন্ত, পূর্ণকান্ত দেবশর্মা, দুর্গাপ্রসাদ দত্ত প্রভৃতি সাহিত্যিকগণ সমধিক প্রসিদ্ধ।

অরুণোদয়ই অসমীয়া ভাষায় প্রথম পত্রিকা ও সমালোচনী। সাহিত্য বিজ্ঞান ইতিহাস পুরাতনী কথা ও পাশ্চাত্য সভ্যতার দানকে অসমীয়াদের গোচর করাইবার জন্যই এই পত্রিকা মিশনরীদের দান। এই পত্রিকা সর্বশ্রেণীর মনে এমন আলোড়ন জাগাইয়াছিল যে ধনী নির্ধন অভিজাত ও সাধারণ সকলেই আগ্রহের সহিত এই পত্রিকা পাঠ করিত। এমন কি অজ্ঞ জনসাধারণ সব পত্রিকারই নামকরণ করিয়াছিল 'অরুণোদয়'।

এই যুগের সাহিত্যের সম্পূর্ণ বিচার-বিশ্লেষণ না করিলেও দু'একটি নিদর্শনে ইহার পুরোগামিনী গতি ও চিন্তার ধারা, আঙ্গিকের পরিবর্তন ও রচনাশৈলীর বৈচিত্র্য, কোন্ দিকে চলিয়াছে তাহা বুঝা যাইবে।

ভোলানাথ দাসের 'সীতাহরণ কাব্য' অমিত্রাক্ষর ছন্দে 'শ্রীমধুসূদন বঙ্গকবি-কুলমণি'কে অনুসরণ করিয়াছে—

সে হি রামায়ণ গীত
গাইবে বাঞ্ছিছো আমি মূঢ় অকিঞ্চন
অমিত্র অক্ষর ছন্দে হে মাতঃ বাগদেবি
যে ছন্দে গাইলা—বহু মধুময় গীত
তব অনুগ্রহে—অতি প্রিয় পুত্র তব
শ্রীমধুসূদন বঙ্গকবিকুলমণি।

এই কবি অত্যন্ত স্বদেশপ্রাণ ছিলেন। বঙ্গকবি হেমচন্দ্রের মত

আসাম কেবল আজিও নিদ্রিত
আসাম কেবল আজিও ঘৃণিত

হে আসামবাসি

বোপা ককা মরি গল এইমতে
এনে কথা আরু নানিবা মুখতে..
নাই বিদ্যাগুণ শিল্পে অনিপুণ
নামমাত্র কৃষি বাণিজ্য নাই
নাই উদারতা নাই সহিষ্ণুতা
নাহিক মমতা পরোপকারিতা..
আছে অহিফেন চির দরিদ্রতা
ছি ছি অসমীয়া, উঠা উঠা উঠা
চির নিদ্রা এড়ি মেলা চকু দুটা।

তাঁর 'মধুহাসি' নামক কবিতা শিশুকাকলীর মাধুর্যে ভরা, মেঘকে বলিতেছেন—'অমৃতেরে দেহ ধুই'।

কবি চন্দ্রকুমার আগরওয়ালার কবিতায়ও এই স্বদেশপ্রীতির ঝঙ্কার বেদনায় মূর্ত হইয়াছে। তিনিও বলিতেছেন—

কি আছে তোমার অসমীয়া ভাই
ধন মান জ্ঞান পেলালা কত
কি দি পূজিবা জগতীচরণ
নিচিন্তা উপায় শ্রী হল হত।

তাঁর 'তেজিমলা' কাব্যে সেই চিরন্তন সত্য ব্যক্ত হইয়াছে 'সবার উপরে মানুষ সত্য'—জয় হোক মানুষের :

মানুহর নাও মানুহর ভাও

তাঁহার 'জলকুঁবরী' কাব্য রোমান্টিক নিসর্গ বর্ণনা। আবার—

গলত হীরক খোপাঁত মাণিক হাঁহিত মুকুতাপান্তি
নীলোৎপল হাতে, চরণর পাশে শঙ্কর ধরল কান্তি

প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের পদে পদে স্মরণ করাইয়া দেয়।

আবার 'সপোন' কবিতাতে কানে কানে কথা কওয়া বিরহবেদনার বাণীটি কাব্যে মূর্তি লইয়াছে, কুমারী মনের একটি স্নিগ্ধ ছবিতে রসে ভরপুর—

আছিলো একদিন ধেমালি মগন
কুমলীয়া বয়সত
নাচি নাচি উরি পখিলাটি আহি
কলোহি মোর কাণত—

যেন 'বসন্তরাগেন যতিতালাভ্যাং' একটি যৌবনস্পন্দনের ছবি।

আর একজন সাহিত্যিক আগরওয়ালা ছিলেন। তাঁর ব্রহ্মযাত্রীর ডায়েরী, Mrs. Hemans এর Better Land নামে কবিতার ভাঙনি, সুখর ঠাই, দেবকন্যা মানবী বেশেরে, জীবনসংগীত প্রভৃতি কবিতা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে।

প্রাচীন যুগের মত এই যুগেও নাটকের আদর ছিল। বিষয়বস্তু কিন্তু পৌরাণিক কাহিনী। লম্বোদর বরার শকুন্তলা ও দুর্গাপ্রসাদ দত্তের বৃষকেতু এই দুইটি নাটক সাহিত্যিক পর্যায়ে উন্নীত হইয়াছে বলা যায়। রাজদর্শনে শকুন্তলার মনের তপোবন-বিরোধী ভাবের আভাস 'বনজ্যোৎস্নাই নতুন ফুলরূপ যৌবন পাইছে' এবং শকুন্তলার বর্ণনা 'তলওঠিটি লতার কুঁড়ি পাতব দরে রঙ্গা (ওষ্ঠরঞ্জনী)', হাত দুটি কোমল শখা তুল্য, আরু সর্বাঙ্গত ফুলর নিচিনা মনোহর যৌবন বিকশিত—মাটির ভিতর পরা চিকমিকীয়া বিজুলী ওলায় নে'—কবির রসজ্ঞানের পরিচয় দেয়; কিন্তু দুষ্মন্তের প্রায় নিক্ষিপ্ত শর 'নেমারির নেমারিব' সত্ত্বেও আশ্রমকন্যার বুকে মীনকেতনের শরেই পর্যবসিত হইল—মহাকবি কালিদাসের এই যে অপূর্ব ভঙ্গী ও নাটকীয় গতি তাহা এই নাটকে পাইনা সত্য কিন্তু মোটের উপর কবির নাট্যজ্ঞান ক্ষীণ নয়। বৃষকেতুও পৌরাণিক নাটক। কিন্তু বৃষকেতুকে নাট্যকার শুধু কথার আতিশয্যে পূর্ণ জ্ঞানী করিয়া তুলিয়া ও কিসের জন্য, দেহ ক্ষণস্থায়ী মাংসপিণ্ড, মরিলে ছাই হইবে না হয় পিপীলিকায় খাইবে ও ব্রহ্মশাপে কার কি হইয়াছিল তাহার সুদীর্ঘ তালিকা দিয়া নাটকীয় রসবোধ ব্যাহত করিয়াছেন। কর্ণ শুধু ভাবিতেছেন—'আহা মোর বোপাই কেনে জ্ঞানবান।'

আবার রসসাহিত্য ও প্রবন্ধগৌরবে 'সদানন্দর কলাধুমটি', 'সদানন্দর নতুন অভিধান', শ্রীলক্ষ্মনাথ বেজবরুয়ার 'কৃপাবর বরুবার কাকতর টোপোলো—পুরণি-তত্ত্ব', 'অসমীয়া জাতি ডাঙ্গর জাতি' প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

সদানন্দ বলিতেছেন—'হে বিলাতী সরস্বতী আই, তুমি মোক favour (অনুগ্রহ) করা'। বিলাতী দেবীসরস্বতীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলে তিনি যদি ড্যাম নিগার নেটিভ বলিয়া তেড়ে উঠেন তাহা হইলে জ্বরে পড়িবার সম্ভাবনা। প্রবন্ধকার রসিক, তিনি চিঠির শেষে সাক্ষর করিতেছেন—

Now good bye
ময় পাঁও ঐ সম্ভ্রম হবলৈ
মহাশয়
আপোনর অধিকতম বাধ্য চাকর
স্যাডানন্দ

সদানন্দের নতুন অভিধানেও বিদ্রূপের কশাঘাত—

বাবু মানে হইতেছে বাব+উ যার বাব আছে। যার মুখত সদাই ইংরাজী কথা, ককালত অতি পাতলা মলমলর ধুতি, মুখত মধু, পেটত বিহ। ভণ্ডামী, শপথ ডাঙ্গর প্রতিজ্ঞা, মিছাকথা আরু রসিকালি। স্বাধীন ব্যবসার এড়া, আপোন জাতিক ঘিনোবা, যার আকাঙ্খা চাকরী আরু উপাধিলাভ ইত্যাদি ইত্যাদি।

অসমীয়া সাহিত্যের এই যুগের মুকুটমণি হইতেছেন শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া। তিনি একাধারে কবি, গল্পলেখক, ঔপন্যাসিক, রসসাহিত্যিক, স্বদেশহিতপ্রাণ। তাহার উপর তিনি নূতন করিয়া শংকরী কৃষ্টি ও শংকরদেব-মাধবদেবকে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে ও বর্তমান শতাব্দীর প্রথমে অসমীয়াদের মনে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি ডিকেন্সের পিকউইক পেপাবের অনুকরণ করেন 'কৃপাবর বরুয়ার ওভতনি'তে। আবার দেখি জৈমিনি ধর্মপক্ষীকে প্রশ্ন করিতেছেন, চুলি দাঁড়ি আর গোঁফের উৎপত্তি কিরূপ। কোকিল মৎসস্য লক্ষণং বিদ্যতে অত্র ইতি দাড়ি। চলতি বায়ুভরণে ইতি চুলি। গো কলত্যত্রঃ গোফঃ ইতি দুগ্ধবোধঃ। লেখক প্রত্ন-তত্ত্বের গবেষণায় বোস্টন্ শহরে অষ্টম বক্তৃতায় দাড়ি নিবারণী সভার স্থাপনায় 'তেঁও বিলাকর ভিতরত যার দড়ীয়া গিরিয়েক আছে, তেঁও তেঁওর স্বামীক হয় নিদড়ীয়া করিব না হয় তেঁওক পরিত্যাগ করিব'।

তাঁহার 'অসমীয়া জাতি ডাঙ্গর জাতি' আর একটি রস রচনা। কবি সখেদে বলিতেছেন—

"আমার নাই কি? উমানন্দ আছে, কামাখ্যা আছে, জয় সাগরের দল আছে, শিবসাগরের দল আছে, ব্রহ্মপুত্র আছে, দীখৌ আছে, অসমীয়া শেক্সপিয়ের আছে, অসমীয়া শেলী আছে, অসমীয়া পপ্ অব বম আছে, অসমীয়া মার্টিন লুথার আছে। অসমীয়ার কলকারখানা বা নাই? কুঁহিয়ার পেরা কলর পরা এন্দুর মরা কললৈকে, বাড়ীযে ধাপে অসমীয়াব কলর অন্ত নাই। বিলাতত টেমচ্ আমার দিখৌ, বিলাতত জাহাজ আমার খেলনাও..

মোমাই তামুলী বরবরুয়া, নরকাসুর ভগদত্ত, নরনারায়ণ রজা..অনন্ত কান্দলী, মণিরাম দেবান, শংকর দেব..
এই এটাইবোর অসমীয়া তেন্তে 'আউর ক্যা ম্যাংতা হেয়' অসমত পকা ঘর নাই—
সেই বারে পাহরে যে অসমত ভূঁইকপ আছে। আকৌ কয় অসমীয়ার টকা নাই—
অসমীয়া মানুহ মৌন মূর্খ হোবা নাই যে টকা উপার্জন করি চিন্তচর্চা বঢ়াই অনর্থর গুটি সিঁচিলব কারণ অর্থমথনর্থং ভাবয় নিত্যং।"

অত্যন্ত দুঃখ ও বেদনার সঙ্গে কবি এই চিত্র আঁকিয়াছেন। আবার অতি উচ্চাঙ্গের লিরিক কবি হিসাবেও সাহিত্যসম্রাট বেজবরুযা খ্যাত। তাহার একটি উদাহরণ দিতেছি—

সন্ধ্যার এক বিচিত্র ছবি কবি আমাদের চোখের সামনে ধরিতেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা, সোনার আঁচল খসা' আমরা পড়িয়াছি। যেন তার পরের কথা কবির মনে উদয় হইতেছে– সন্ধ্যা আসিতেছে, দূরে তার নূপুরধ্বনি 'ঝিলি

নূপুরর রূপ ধরি বাজে পায় রুণু জুনু করি' 'জোনাকি পরুবা সাতসরি জ্বলিছে ডিঙ্গত শারীশারী জিলিকিনি ধরয় চকুত' চক্ষুতে ঝিলিক লাগাইয়া দিতেছে— আকাশে ধ্রুবমণ্ডল সপ্তর্ষি উদয় হইতেছেন, দেবালয়ে আরতি হইতেছে, হরিধ্বনিতে মন পবিত্র, মৃদঙ্গ গোমুখ করতাল বাজিতেছে। আবার 'মরমে মরমে মরম নিগড় বান্ধনী বোলে মিছাই', 'সুগোল সুঠাম সবলি বলিত বাহু জংঘা উরু কর' রস-স্নিগ্ধতায় বৈষ্ণব কবিকেও হার মানাইয়া দেয়—

> কি কাম দীঘল মেঘ বরণীয়া সাগরর ঢউ চুলি
> প্রেম পগলার হৃদয় তবণী বুরি পায় গই তলি
> মৃণাল দুবাহু কি কাম সাধিব মত্ত প্রণয়ীর ডোল
> মিহি মউমাত বিয়াধর বাঁহী বাখি করি গুঠভোল।

'পদ্মকুমারী' উপন্যাস হিসাবে সার্থক না হইলেও তখনকার দিনের বাংলা উপন্যাসের অনুকরণ।—

> "পাঠক সেই ছোরালীজনী কোন আপুনি চিনি পাইছেন? পাঠক অলপ থির হওক লাহে লাহে সকল প্রশ্নের উত্তর পাব.."

কিন্তু বেজবরুয়া গৌহাটির এমন সুন্দর বর্ণনা দিয়াছেন যে অন্যত্র কোথাও তেমনটি পাওয়া যায় না।

"প্রকৃতির কাম্যকানন, গগনভেদী পর্বতমালারে পরিবেষ্টিত পবিত্র সলিল ব্রহ্ম-পুত্র নদর পবিত্র জলেরে বিধৌত, অসংখ্য তীর্থস্থানেব সমাকীর্ণ..যার প্রাগ্‌জ্যোতিষ নাম ভুবনবিদিত, যার রজা যোল হাজার কন্যাব অধিপতি পৃথিবীর পুত্র নরকাসুর আরু মহাভারতর যুদ্ধর বিখ্যাত হস্তী রথারোহী মহাবীব বৃদ্ধ ভগদত্ত, যি গুবাহাটির নিলাচল পর্বতত মহামায়া ভগবতীর প্রধান পীঠস্থান কামাখ্যা বর্তমান,.. যি গুবাহাটির অগ্নিকোণের সন্ধ্যাচল পর্বতত ত্রিসন্ধা পরিপূত হৃদয় বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম...... যি গুবাহাটির বেলতলা নামেরে স্থান ষষ্টিসহস্র শিষ্য পরিবেষ্টিত মহামুনি গাল্ববর অমৃত নির্যান্দনী বেদধ্বনিরে প্রতি-ধ্বনিত হৈছিল, পূজণীয় গোকর্ণ ঋষির সামবেদ গীতত যে গুবাহাটি হাজো নামক হয়গ্রীব মাধবর পুণ্যভূমির কর্ণ আপ্লুত।"

তাঁহার "দাণ্ডিনাথের ফুল", "সাধনা", "চিন্তাহরণের সংসার চিত্র", "বুঢ়ি আইর সাধু", "পাচনি", "কদমকলি", ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। "তেওঁর এই হাঁহি, এই রস খলখলাই ছলছলাই বৈ আহিছে নানারূপে নানা ভঙ্গি মারে"।

'অ মোর আপোনর দেশ' জাতীয় সঙ্গীত তাঁহার অক্ষয় কীর্তি।

রজনীকান্ত বরদলৈর 'মনোমতী', 'মিরিজিয়রী', 'নির্মল ভকত', 'রাধারুকিণীর রণ' ও 'তাম্রেশ্বরীর মন্দির' সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। মনোমতী বা ময়নামতীতে সখী প্রমীলা রসিকা, সে বলে প্রাণ নেওয়া বা দেওয়া ওসব যাক 'সখি মই পিশাচক্ বান্দরের দরে নচুরাম্'। বেণুধর রাজখোয়ার 'সেউতি কিবণ' একটি সামাজিক নাটক। পদ্মনাথ বড়ুয়ার 'ভানুমতী' গল্প হিসাবে আজিকার পরিপ্রেক্ষিতে খুব সচল না হইলেও একটা সূক্ষ্ম বেদনার ধারা ইহাকে কিছুটা রসোত্তীর্ণ করিয়াছে। তাঁহার 'লীলা' নামক কবিতাটি আর একটু উঁচু স্তরের। প্রকৃতি ও পুরুষের

মিলনকে অর্ধনারীশ্বরের লীলা কল্পনা করিয়া ইহাকে কবি দার্শনিক উচ্চ তথ্যে লইয়া গিয়াছেন। এইরূপ মানবলীলা আরম্ভ হইল—

প্রবাহিল প্রেমনদী প্রতি শিরেশিরে
উতলি ভিতরি এক আবেগ হিয়ার..
অর্দ্ধাঙ্গ মিলনে হায় অর্দ্ধাঙ্গিণী সতে

রবীন্দ্রনাথের 'প্রতি অঙ্গ কাঁদে মোর প্রতি অঙ্গ তরে' ও সমধর্মী অপূর্ব রসবিদগ্ধ কবিতাগুলিকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

তাঁহাদের পরবর্তী সাহিত্যিকেরা অপেক্ষাকৃত আধুনিক ও অনেকেই জীবিত। তাঁহারা অসমীয়া রসিকজনের রসপিপাসা মিটাইতেছেন। গল্পের আসর জুড়িয়া বসিয়া আছেন দণ্ডীনাথ কলিতা, দৈবচন্দ্র তালুকদার, বীণা বড়ুয়া, আব্দুল মালিক, ত্রৈলোক্য গোস্বামী প্রভৃতি। জাতীয়তামূলক কবিতা লিখিয়া লক্ষ্মীনাথ অমর কীর্তি লাভ করিয়াছেন, তাহা পূর্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে। এই যুগের প্রথম শ্রেণীর অসমীয়া কবিগণের মধ্যে বিহগী কবি রঘুনাথ চৌধুরীকে উচ্চ স্থান দেওয়া হইয়া থাকে। রঘুনাথ প্রধানতঃ প্রকৃতির কবি। তাঁহার মধ্যে pagan abandon আছে—তাঁহার কাছে প্রকৃতি ধরা দিয়াছে নব নব রূপে নব নব উন্মেষে। 'সাদরী' 'কেতেকী', 'দহিকতরা', অনবদ্য রসের উৎস। নলিনীবালা দেবী ও ধর্মেশ্বরী দেবী দুইজন প্রখ্যাতা মহিলা কবি, দুইজনেই অতীন্দ্রিয়বাদী (mystic)। নলিনীবালার 'সপোনর সুর', 'সন্ধিয়ার সুর' ও ধর্মেশ্বরীর 'ফুলর শবাই' গ্রন্থ বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষণ করে। যতীন দুয়ারা 'ওমর খৈয়ামে'র কবি। তাঁহার 'আপোন সুর' ও 'কথা কবিতা'ও প্রসিদ্ধ। বিনন্দ বড়ুয়া (প্রতিধ্বনি), নীলমণি ফুকন (জ্যোতিকণা), অম্বিকাগিরি রায়চৌধুরী (তুমি), দুর্গেশ্বর শর্মা (অঞ্জলি), রত্নকান্ত বরকাকতি (জেবালি), ডিমেশ্বর নিওগ (বিচিত্রা), অতুল হাজারিকা (দীপালি), দেবকান্ত বরুয়া (সাগর দেখিছা), গণেশ গগৈ (পাপরী) প্রভৃতি কবিগণ কবিতা রচনা করিয়া অসমীয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

আধুনিক যুগের অসমীয়া নাটকগুলিকে প্রধানতঃ দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে। (১) মৌলিক রচনা ও (২) অনুবাদ। ভারতীয় ও বিদেশীয় বিভিন্ন ভাষা হইতে বহু নাটক অসমীয়া ভাষায় অনূদিত হইয়াছে। তাহার মধ্যে শকুন্তলা, কুমার-সম্ভব, ম্যাকবেথ, মার্চেণ্ট অব ভেনিস প্রভৃতির নাম করা যাইতে পারে। এই যুগের প্রধান নাট্যকারগণের মধ্যে আছেন হেমচন্দ্র বরুয়া (কানিয়ার কীর্তন), গুণাভিরাম (রামনবমী), পদ্মনাথ গোহাই বড়ুয়া (গাঁওবুড়া), নকুলচন্দ্র ভূঞা (বদন বড় ফুকন), কমলানন্দ ভট্টাচার্য (নগা কোঁয়র), অতুলচন্দ্র হাজারিকা (কুরুক্ষেত্র), প্রবীণ ফুকন (মণিরাম দেওয়ান)।

অনুবাদ সাহিত্যে শরৎচন্দ্রের দেবদাস, হ্যামসুনের *Growth of the Soil* মাটি আরু মানুহ, রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ, বঙ্কিমচন্দ্রের বিষবৃক্ষ অসমীয়া জনসাধারণের দৃষ্টি পথে লইয়া আসিয়াছেন শিলংএর চপলা বুকস্টল। হেমচন্দ্র গোস্বামী, সর্বেশ্বর বরকটকী ও রাজমোহন নাথ, সূর্যকুমার ভূঞা, বেণুধর শর্মা, কালীরাম মেধি, বিরিঞ্চি বরুয়া, বাণীকণ্ঠ কাকতি, উপেন লেখারু, ডিম্বেশ্বর নিওগ সাহিত্য, ইতিহাস ও সংস্কৃতিমূলক পুস্তক ও প্রবন্ধের সাহায্যে অসমীয়া কৃষ্টিকে

উজ্জ্বল করিয়াছেন। অন্যান্য প্রবন্ধকারগণের মধ্যে ত্রৈলোক্য গোস্বামী, উমাকান্ত শর্মা, তীর্থনাথ শর্মা, মহেশ্বর নিওগ, প্রফুল্লদত্ত গোস্বামী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। নলিনীবালা দেবীর 'স্মৃতিতীর্থ' ও কাশীনাথ বর্মণের 'নারীরত্ন' আধুনিক অসমীয়া জীবনী-সাহিত্যের দুখানি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ।

শিশু সাহিত্যে গ্রীচ দেশর সাধু, ডেভিড্ কোপারফিল্ড, মাণিকী-মধুরীর নাম করা যাইতে পারে।

রসসাহিত্যে শ্রীযুক্ত হরিপ্রসাদ বরুয়া ও শ্রীপীতাম্বররাজ মেধির নামও উল্লেখযোগ্য। শ্রীযুক্ত কেশবনারায়ণ দত্ত ঐতিহাসিক প্রবন্ধে ও শ্রীজিতেন্দ্রনাথ দত্ত সামাজিক প্রবন্ধে অসমীয়া সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করিয়াছেন।

এই একশো বছরের ইতিহাসে অসমীয়া সাহিত্যে তিনটি বিশিষ্ট প্রভাব পড়িয়াছে। প্রথমতঃ ইংরেজীর মাধ্যমে ইউরোপীয় সাহিত্য দর্শন ও বিজ্ঞানের প্রভাব পড়িয়াছে, বিশেষ করিয়া মিশনরীদের কল্যাণে ও সাহায্যে। দ্বিতীয়তঃ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতবর্ষে এক নব জাগৃতির সূচনা করে। বাঙালীরা মহাভারতের কথাই শুনাইয়াছিলেন—ভারতবর্ষের দিকে দিকে সামাজিক প্রয়োজন ও সমসাময়িক উত্তেজনার ঊর্ধ্বে উঠিয়া। অপরের লাঞ্ছনা ও অবজ্ঞা হইতে, ক্ষুধার নির্মমতা হইতে, কুশিক্ষার অন্ধকার হইতে ভারত-ইতিহাসের চিরলক্ষ্মীকে তাঁহারা বরণ করিয়াছিলেন শুধু নিজের গোষ্ঠে ও গৃহে নয়, প্রতিবেশী প্রদেশেও। ভুল ভ্রান্তি অহমিকা তুচ্ছতা ক্ষুদ্রতা হয়তো ছিল, কিন্তু সাংস্কৃতিক এই চেতনাকে উদ্বুদ্ধ করা বাংলার ঊনবিংশ শতাব্দীর অর্ঘ্য ভারতমাতার পাদপদ্মে। রাজা রামমোহন হইতে রবীন্দ্রনাথ শ্রীঅরবিন্দ বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ বঙ্কিম শরৎ ভারতের অন্য প্রদেশকে সাহিত্যে দর্শনে চিন্তায় মৌলিক গবেষণায়, সামাজিক সংস্কারে প্রবুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার তরঙ্গ আসামে প্রবেশ করিবে, ইহা যেমন অস্বাভাবিক নয় তেমনি অযৌক্তিকও নয়।

তৃতীয়তঃ ইংরেজি শিক্ষা ও প্রসারের সঙ্গেসঙ্গে গবেষণা-বিচার-বিতর্কের মধ্য দিয়া নিজেদের প্রাচীন সংস্কৃতির প্রতি একটা গভীর মমত্ববোধ জাগিয়া উঠিল। নূতন করিয়া বৈষ্ণব মহাপুরুষদের কথা ও কাহিনী, সাহিত্য ও দর্শন শিক্ষিত মনে নূতন ভাব ও চিন্তার ধারা সৃষ্টি করিল, সাহিত্যে তাহার প্রকাশ পাইল।

বর্তমান অসমীয়া সাহিত্যের গতি এই ত্রিধারার ত্রিবেণীসঙ্গমে, এ কথা বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ১৯৩৯ সালে অনুষ্ঠিত অসম সাহিত্য সম্মেলনের অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। পরবর্তী বারো বছরের যুগান্তকারী ইতিহাসের আলোড়ন সমস্ত জগতের সব সাহিত্যকে প্রভাবান্বিত করিলেও মোটামুটি তিনি তখন যাহা বলিয়াছিলেন আজও তাহা প্রযুজ্য—

"পশ্চিমীয়া লিখা আমার দেশলৈ নিজরি আহে ঘাই কৈ ইংরাজী ভাষায় জরিয়তে। কাজেই নতুন ধরণর এই লিখাই প্রতিভাবান বাঙালী লিখক সকলকো উদ্বুদ্ধ করিলে। আমার দেশত প্রভাব আছে বঙলারো, ইংরাজীরো।"

অর্থাৎ ইংরাজী ভাষার মাধ্যমেই পশ্চিম দেশীয় লেখার সহিত আমার দেশের পরিচয়। প্রতিভাবান বাঙালী লেখকরাই এই নতুন ধরনের লেখায় সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন।

তিনি একটি উদাহরণ দেন—গল্প নামটি লওয়া হইয়াছে বাংলা দেশ হইতে, কিন্তু সকলের সমন্বয়ে ইহার সৃষ্টি 'কিছু মান গল্পর ধরণ অবশ্যে অল্প পুরণি'। অন্য

একজন সমালোচক বলিয়াছেন 'সব গল্পেরই ঘটনা যেন বাংলা দেশের—অসমীয়া বিশেষত্বের ছাপ পড়ে না । এইরূপ সমালোচনার মূল্য নাই একথা নিরপেক্ষ সমালোচক বলিতে পারেন না। আরো আধুনিক যুগের সাহিত্যের কথা এখানে বিচার হইতেছে না। অসমীয়া সাহিত্যেও কণ্টিনেণ্টাল সাহিত্যের ছাপ পড়িতেছে এ বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং ন্যুট হ্যামসুন প্রভৃতি সুপ্রসিদ্ধ লেখকদের পুস্তকের অনুবাদও প্রকাশিত হইতেছে। মনে হয়, ভবিষ্যতে অসমীয়া সাহিত্য বাংলা, ইংরেজি ও প্রাচীন বৈষ্ণব কবিদের প্রভাব কাটাইয়া বিশ্বসাহিত্যের সহিত যোগ রাখিয়া, স্বয়ম্পূর্ণ সাহিত্যে পরিণত হইবে, আজ তাহারই প্রস্তুতি চলিতেছে।